প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ ও প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত বাংলা গল্পের ধারাবাহিক পর্যালোচনা

যুগে যুগে মানুষ ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। প্রতিবাদ শব্দের অভিধানিক অর্থ হলো আপত্তি। আর্থসামাজিক -রাজনৈতিক দুর্নীতি, শোষণ দমন-পীড়ন-অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই হল প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ। এর মধ্য দিয়ে বিদ্রোহ বা আন্দোলন সংগঠিত হয়। সমাজের বিরোধী শক্তির পরাজয় হয়। সমাজের সংস্কার ঘটে। সমাজ সুস্থ-সুন্দর হয়। সমাজবদ্ধ মানুষ সুখী হয় স্বচ্ছন্দ হয়। আর 'বিদ্রোহ' শব্দটির অর্থ হল বশ্যতা বা আনুগত্য অস্বীকার, শাসন বা প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা। এই প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ আদিম যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি চলে আসছে। একটা সুস্থ শান্তিকামী উন্নত দেশে এর প্রবণতা কম। রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র প্রতিটি শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই কম বেশি প্রতিবাদ দেখা যায়। এই প্রতিবাদের জন্ম হল বৈষম্য থেকে ও অসংগতি থেকে। সত্য ও সুন্দরের পূজারী প্রতিটি মানুষ সত্য সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যখন সত্য-সুন্দর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পদে পদে বাধার সৃষ্টি হয় তখনই মানুষ সেই প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং তা থেকেই বিদ্রোহের সূচনা ঘটে। সেই সুদূর আদিম সমাজ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সবলরা দুর্বলের উপর অত্যাচার চালিয়ে আসছে সে পুরুষ বা নারী যাই হোকনা কেন।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের সুস্থতা ও সৌন্দর্যেই সমাজবদ্ধ মানুষের মঙ্গল। সমাজের প্রতিটি মানুষের সম অধিকার থাকাটাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম ঘটে। তখনই রূপ নেয় সমাজ বিদ্রোহের। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ নূতন নূতন ভাবে রূপ নেয়। অত্যাচার শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য, কুসংস্কার থেকে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। শোষকশ্রেণি ও শোষিত শ্রেণি, শ্রেণি বিভক্ত সমাজের ধারায় এই দুই শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমাজ জীবনে আমরা দেখি পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথা ও বর্ণ বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি নানা প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে জোতদার ও জমিদার শ্রেণি কৃষকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। এর ফলে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ দানা বাঁধছে। শিল্পপতিরা শ্রমিকদের উপর শোষণ যন্ত্র চালিয়ে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ফলে শ্রমিকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে।

অন্যদিকে রক্ষণশীলদের সঙ্গে প্রগতিশীলদের দ্বন্দ্ব সংগঠিত হচ্ছে। রাজনৈতিক ভন্ডামি সমাজ জীবনকে যখন বিপথে পরিচালিত করে, তখন তার বিরুদ্ধে রাজনীতি সচেতন মানুষ রুখে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে প্রশাসনিক দুর্বলতা যখন মানুষের জীবনকে বিষময় করে তোলে সে সময় প্রশাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়।

কোন ব্যক্তি যখন অন্যায় কাজ করে থাকে, সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে।

কোন পরিবারের কোন সদস্য যদি অন্যায় কাজে রত থাকে তখন সেই অন্যায় থেকে বিরত থাকবার জন্য অন্য সদস্যরা প্রতিবাদ জানিয়ে থাকে।

সমাজের প্রচলিত প্রথা যদি জনস্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় তখন তার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ-মুখর হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক শোষণও প্রতিবাদের এক বৃহত্তর ক্ষেত্র। কিংবা ধর্মান্ধ মানুষ যখন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয় তখন সেই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এছাড়া রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে কিংবা প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতি প্রবেশ করে ও শিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দূরীকরণের জন্য সচেতন মানুষ প্রতিবাদ জানায়।

প্রতিবাদের এই ক্ষেত্রগুলি যখন ভাষার মাধ্যমে রূপায়িত হয় তখনই তা প্রতিবাদী ভাষারূপে চিহ্নিত হয়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির মধ্যে গল্পই হল প্রতিবাদী ভাবনার সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল এবং প্রকাশের মাধ্যম। পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনার প্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটেছিল। এই ধারাতেই বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত গল্পেরও সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

প্রতিবাদী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণের পর আমরা এগিয়ে যাবো প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত বাংলা গল্পের ধারাবাহিক পর্যালোচনার দিকে যার মধ্য দিয়ে প্রাক্ স্বাধীনতা ও উত্তর স্বাধীনতা পর্বের মহিলা গল্পকারদের চিন্তা চেতনা ধরা পড়েছে।

নিম্নে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত গল্পগুলি উল্লেখ করা চলে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের অন্যতম কথাকার। সমাজ সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে তিনি গল্প রচনায় ব্রতী হন। তিনি তাঁর পরিচিত সমাজের মানুষের মধ্যে যে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা লক্ষ করেছেন, মানবতাবাদী লেখক হিসেবে তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পশুবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মুখোশ তিনি খুলে দিতে চেয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ জীবনের অসংগতিগুলি দূর করবার জন্য তিনি ব্যঙ্গ গল্পগুলো রচনা করেছেন। যে গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন হিসেবে বিবেচিত। সমাজজীবনের শুচিতা ও সুস্থতা ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। অপরাধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে তিনি ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেছেন এবং তাদের লঘু শাস্তি দিয়ে চারিত্রিক সংশোধনের ব্যবস্থা করেছেন। 'কঙ্কাবতী,' 'বাঙাল,' 'নিধিরাম,' 'রূপসী,' হিরন্ময়,' 'ময়না কোথায়,' 'সে কালের কথা', 'পাপের পরিণাম,' 'ফোকলা দিগম্বর' প্রভৃতি উপন্যাসে উদ্দেশ্যমূলক দিক থাকলেও হাস্যরসের তুলিতে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের রঙে এসবকে রাঙিয়ে দিয়েছেন।

'মুক্তমালা', 'ভূত ও মানুষ,' 'মজার গল্প' ও 'ডমরু' চরিত্র প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে রূপকের আবরণে দেশকাল ও সমাজের প্রেক্ষিতে সরস মন্তব্যের ছোঁয়া রয়েছে। 'ভূত ও মানুষ' গল্পগ্রন্থে কিছু কল্পিত ভূত রয়েছে, যে ভূতগুলি রূপকের আড়ালে মানুষ। মানুষের অসংগতি দেখানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ এই ভূত চরিত্রগুলিকে স্থাপন করেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর মতে – "মানুষের অসংগতি দেখাইতে হইলে তাহার সহিত তুল্য আবশ্যক। ভূতপ্রেতের সমাজের মানব সমাজের তুলনা অতিশয় সহজ ও বহুল প্রচলিত। কাজেই তাঁহাকে [ত্রৈলোক্যনাথকে] বাধ্য হইয়া ভূতপ্রেতের সমাজের সঙ্গে সাহায্য লইতে হইয়াছে। মানুষকে ব্যঙ্গ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, ভৌতিক গল্প বলা নয়।"১

'নয়ন চাঁদের ব্যবসা' গল্পে নয়নচাঁদ কিভাবে ব্যবসাবাণিজ্য করে লাভবান হয়েছে তা দেখিয়েছেন। এটি একজন গুলিখোর নেশার আড্ডার গল্প। এই আড্ডা বসতো সন্ধ্যেবেলা। নয়নচাঁদ, লম্বোদর, গগন ও আরও কয়েকজন মিলে বসতো আড্ডার আসরে। মা শীতলার প্রতি যাতে আড্ডাধারীদের ভয় ও ভক্তি দুটোই জাগ্রত হয় সেই উপলক্ষে নয়নচাঁদ শীতলার স্বপ্নাদেশের গল্প শুনিয়ে যায়। কলকাতায় যখন বসন্ত রোগের হিরিক পড়ে তখন নয়নচাঁদ, খাঁটি মালমশলা দিয়ে একটি শীতলা মূর্তি তৈরী করে। কলকাতায় সে পাণ্ডা হিসেবে শীতলামূর্তি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষেতে বের হয়ে অর্থ রোজগার শুরু করে। একদিন মাতাল মিত্তিরদার বাড়িতে ভিক্ষে করতে গিয়ে নয়নচাঁদের যা অবস্থা হল - "মাতালের এক একটি কিলে" নয়নচাঁদের পিঠের "ছাল খুলিয়া গেল।" মাতাল নয়নচাঁদের সাধের শীতলা কেড়ে নিল। নয়নচাঁদ পালাল। মনে মনে সে শীতলাকে বলল-"মা! আর তোমার গান করিতে চাই না, তোমার চাল পয়সা আর চাইনা। পিঠের হাড়গুলি যে চুরমার হইয়া গিয়াছে. এখন তাই তুমি রক্ষা কর।" ২

নয়নচাঁদ মার খেয়ে পালিয়ে আসে। তার কিছুদিন পর মাতালটি নয়নচাঁদকে শীতলা নিয়ে আসবার জন্য একটি চিঠি দিল। মাতালটি ইতিমধ্যে মরে ভূত হয়ে গেছে। কর্ত্তা ভূতটি নয়নচাঁদকে তার পরিণতি ও মর্ত্যে আগমনের গল্প শোনাল। এই গল্পে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের অসাড়তা, দেব

আরাধনায় ভণ্ডামি, ধর্ম ব্যবসায়ীদের বুজরুকির প্রতি গল্পকার ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন। 'বিদ্যাধরীর অরুচি' গল্পে আছে ব্যঙ্গ। এটি একটি কৌতুক রসের গল্প। নীলাম্বর ঘোষ এক ধনী গৃহস্থ। তার ঝি ও চাকরের অভাব নেই। তারা প্রত্যহ ভাঁড়ার লুঠ করে। এই নিয়ে কখনো কখনো নিজেরাই বিবাদে লিপ্ত হয়। বিদ্যাধরী ভালো জিনিসগুলো খেয়ে নিয়ে পুরুষোত্তমকে দোষী সাজায়। এরপর গিন্নীকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় পুরুষোত্তমের হাতে। অতঃপর পুরুষোত্তমের বিতাড়ন ঘটে।

ত্রৈলোক্যনাথ চাকর, ঝি, ব্রাহ্মণদের উপর বেশী ক্ষমতা আরোপ করলে সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হয়, একথাই বলতে চেয়েছেন। 'পূজার ভূত' একটি মজার গল্প। এই গল্পে আমরা দেখি জগমোহন রায়চৌধুরী ঘরজামাই করে রাখতে চেয়েছিল তার জামাতাকে। কিন্তু জামাই এতে অসম্মতি প্রকাশ করলে জগমোহন তার জামাই ও কন্যা রাসমণিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং তার মুখদর্শন করবে না এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়। দশ বছর পর পুজো উপলক্ষে বিধবা রাসমণি তার ছোট মেয়েটিকে নিয়ে ফিরে আসে তার পিতৃগৃহে। মহাষ্টমীর দিনে কন্যা ও নাতনিকে জগমোহন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বাড়ি থেকে যাবার সময় বিতাড়িত রাসমণি দুঃখে বাবাকে অভিশাপ দেয় তার বাবার গৃহ লক্ষ্মীশূন্য হবে। রাসমণির অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। পক্ষাঘাতে তার পিতার মৃত্যু হওয়াতে জমিদারের সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে গেল।

ত্রৈলোক্যনাথ ধর্মীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বিদ্রুপ করেছেন। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য নিম্নলিখিত দুটি গল্প থেকে সার্থক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন — "লুল্লু যখন বলে, আমাদের ধর্ম কিঞ্চিত কাঁচা, যেরূপ অপক্ব মৃত্তিকাভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়" — তখন তত্ত্বকে সরিয়ে দিয়ে উপহাসটি সামনে চলে আসে। 'পাপের পরিণাম' কাহিনীর ধনুকধারী সনাতন হিন্দুধর্মের বিকৃত রূপটির কথা সুরালোকে এই ভাষায় জানায়, 'মানুষকে ঘৃণা কর, ইহাই আমাদের ধর্মের সার, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম ইহা নহে, ইহা পাপ।"৩

'ডমরুচরিত' ত্রৈলোক্যনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। মানুষের ভণ্ডামি ও অসাধুতাকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন লেখক। কোথাও বা স্বদেশী মোহগ্রস্ত হুজুগ প্রিয় বাঙালিদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। দেশের রাজনীতির অসাড়তাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুযোগসন্ধানী নেতাদের ব্যক্তিত্বের অসাড়তা, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, অকপট দেশভক্তিকে লেখক বিদ্রূপ করেছিলেন। যাদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম নেই শুধু আছে অসৎ উপায়ে আখের গুছানোর চিন্তা, এমনই এক চরিত্র হল ডমরুধর। ডমরুধর অতি অসৎ। সে দুর্নীতিগ্রস্ত ধুরন্ধর ব্যবসায়ী। এঁটেল মাটি দিয়ে কাগজ প্রস্তুত হবে, এধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বদেশী কোম্পানী খুলে শেয়ার বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছে কোষাধ্যক্ষ ডমরুধর। পরে ব্যবসায় লোকসান দেখিয়ে টাকাগুলো সে আত্মসাৎ করে। এমনকি পার্টনার শংকর ঘোষকেও সে বঞ্চিত করে।

'চিত্রগুপ্ত-যম-যমনী-পুঁইশাক' এই গল্পে এক সন্ন্যাসীর প্রতারণায় ডমরুধরের মৃত্যু হয়। স্বর্গলোকে যাবার সময় দুজন যমদূত ডমরুধরকে যমরাজের বিচারসভায় নিয়ে আসে। বিচার চলাকালে যম ডমরুধরের কাছে শুনতে পেলেন সে একাদশীর দিনে পুঁইশাক খায়নি। সেই পুণ্যাত্মার আগমনে যমালয় পবিত্র হয়, শঙ্খবাজে, পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। ডমরুধরের জন্য একটি স্বর্গ নির্মাণ করেছেন বিশ্বকর্মা। যম যখন চিত্রগুপ্তের কাছে জানতে পারেন পৃথিবীতে তার আয়ু শেষ হয়নি। তখনই যম ক্রুদ্ধ হয়ে আদেশ করেন তার মাথায় দশ ঘা ডাঙ্গস মেরে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিতে। যমদূতের আঘাত খেয়ে ডমরুধর পৃথিবীতে আসে। 'চঞ্চলার গাই গরু' গল্পে ডমরুধর শঙ্কর ঘোষ ও ভিখু ডাক্তারকে প্রতারণা করে। এর ফলে তারা প্রতিশোধ নিতে আসে। তাঁরা চঞ্চলার গাই গরুর দেহের সঙ্গে ডমরুধরের দেহ বেঁধে রেখে যোগ্য শাস্তি দেন।

রথীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন —"বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র কথক ডমরুধরের জুড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্রের'কমলাকান্ত' প্রমথচৌধুরীর 'নীললোহিত', ঘোষাল, পরশুরামের কেদার চাটুজ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ কথক।।"[৪] প্রসঙ্গত 'কুম্ভির বিভ্রাট' গল্পটি উল্লেখ্য। মৃত কুমিরের পেটে সাঁওতাল রমণী ঝুড়ির উপর বসে বেগুন বিক্রী করছে এই আজগুবি গল্প শোনায় ডমরুধর। শঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন করে সেখানে খোদ্দের কোথায় পাবে। তার প্রমাণ দিতে গিয়ে কোমরে পড়ে থাকা কুমিরের দাঁত দেখিয়ে দেয়। এটি আজগুবি গল্প বললে ডমরুধর রেগে গিয়ে বলে- "আজগুবি গল্প কলির ধর্ম বটে।"৫

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন-"ডমরুধর বঙ্গসাহিত্যে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। তাহার সমস্ত দুস্ক্রিয়া শক্তি ও ঘোরতর নীচ স্বার্থপরতা সত্ত্বেও তাহার সপ্রতিভা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আপনার সম্বন্ধে কাহিনী, নয়নচাঁদের ব্যবসা আমাদের সেই কথাই শোনায়।" ৬

ধারাবাহিকতার সূত্র ধরে এর পর এসেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। রবীন্দ্রনাথের জেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্র-সমকালে সাহিত্য চর্চ করে একটি নিজস্ব গল্পধারার প্রবর্তন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হন নি। স্বর্ণকুমারীর পূর্বে নারী সাহিত্যিকের প্রকাশ ঘটলেও তাঁদের লেখায় স্বর্ণকুমারীর মতো নারীশক্তিকে জাগিয়ে তোলার উল্লেখযোগ্য কোন ইঙ্গিত ছিল না। উনিশ শতকের নারী স্বাধীনতা উন্মেষের ঋত্বিক হিসেবে স্বর্ণকুমারী দেবী পরিচিত। একদিকে পারিবারিক প্রভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত সংস্কারমুক্ত চিন্তা স্বর্ণকুমারীকে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান করে দেয়। তাঁর গল্পে প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় মেলে। নারী-পুরুষের সম-অধিকারের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বাল-বিধবাবিবাহকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। তৎকালীন রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর গল্পে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

নারীকল্যাণে নিবেদিত প্রাণা স্বর্ণকুমারী অনাথ ও অসহায় নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর রচিত গল্পে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। ডঃ ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন- "ব্যক্তি স্বর্ণকুমারীর অন্তরালে আত্মগোপন করেছিল একটি পারিপাট্য লুব্ধ নারীমন। তাঁর শিল্পকর্মে সেই 'নঢ়নক্ষশতর জবন'-রই জয়জয়কার। .....তিনি সমাজলাঞ্ছিত নারী ব্যক্তিত্বের বেদনা সমানভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন নিজের নারীসত্তার স্বভাব শক্তি দিয়ে। আর নারীত্বের এই রক্তক্ষরা গোপন বেদনার অনায়াস চিত্রণেই তিনি অতুলনীয় হয়ে উঠেছিলেন।" ৭

তাঁর গল্পে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ নেই কিন্তু সূক্ষ্ম প্রতিবাদ আছে। 'কেন', 'রক্তপিপাসু', 'তিনটি দৃশ্য', 'যমুনা', 'পেনেপ্রীতি', 'লজ্জাবতী','ক্ষত্রিয় রমণী', 'নবডাকাতের ডায়েরী', 'চাবি চুরি', 'জীবন অভিনয়', প্রভৃতি গল্পে সূক্ষ্মবোধ বিশ্লেষণের শক্তি ও মানবিকতার জয় ঘোষিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী যে সময় গল্প রচনা করেছেন তখন প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত গল্পের পূর্বসূরী হিসেবে কোন উল্লেখযোগ্য গল্পকারকে পান নি। ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক উপাদান রয়েছে। স্বর্ণকুমারী তাঁর গল্পে ব্যঙ্গধর্মিতা পরিহার করেছেন।

এবার আসছি রবীন্দ্রনাথের কথায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সার্থক গল্পকার। তিনি তাঁর 'গল্পগুচ্ছের' চারটি খণ্ডে, 'সে ও লিপিকা' গল্পগ্রন্থে প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। নারীমুক্তি থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক পটভূমিতে তিনি তাঁর গল্পগুলি লিখেছেন। নারীমুক্তির ছবি আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-উপন্যাসে-গল্পে-নৃত্যনাট্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন।

"স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার -সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।"৮

এরূপ সমানাধিকারের কথা উল্লেখ করে নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে নারী,পুরুষের সমানাধিকারের কথা কেউ এভাবে জোর দিয়ে বলেন নি। তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। ঈশ্বরের প্রতি সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে।

"শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি
চিনে লব সার্থকের পথ ?
.....
নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?

.....

হে বিধাতা, আমারে রেখোনা বাক্যহীনা -
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।" ৯

সামাজিক অনুশাসনের রুদ্ররোষের শিকার নারীর জন্য রবীন্দ্রনাথ যে আর্জি জানিয়েছেন নারীর নিজ ভাগ্য জয় করবার জন্য সে দুটি হল -চৈতন্য, যা শিক্ষাসাপেক্ষ ও সংঘশক্তি, যা বর্তমানে শোষণভিত্তিক সমাজ পরিবর্তনের জন্য অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথকে নারীর দুঃখমোচনের ত্রাতা রূপে আমরা দেখি। মনের ভয় দূর করে আত্মরক্ষা করতে হবে নারীকে, শক্তি সঞ্চয় করে দুর্জনকে দমন ও দুর্বলকে রক্ষা করতে হবে নারীকে। তিনি একটি গানে লিখেছেন —

"সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরই অপমান।
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মান।
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো
নিজেরে করো জয়.....।"১০

নারীকে সবলা হওয়ার শক্তি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন- "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সেদিন 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য আলোচনার প্রাক্কালে বলেছেন,—
'নারীর তপস্যা পুরুষের অনুকরণে নয়।' আরও বলেছেন,
'পৌরুষের ভারে চাপা পড়া নারীত্ব প্রেমের
পরশে আত্মোপলব্ধি করল'- চিত্রাঙ্গদার
এই কারিনী মানবধর্মের লীলা।" ১১

বহুদিন থেকে নারী-পুরুষ-এর সমানাধিকার নিয়ে চলে আসা বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে তিনি বললেন নারী পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই কম নয় তারই ফলস্বরূপ 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে —

"পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে সে নহি নহি
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে

পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।" ১২

এভাবে রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের পায়ে-পা মিলিয়ে একই সাথে এগিয়ে চলার বার্তা দিয়ে গেলেন। জীবনে গোধূলি লগ্নের কাব্য 'আরোগ্য'তে রবীন্দ্রনাথ নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন-

"নারী তুমি ধন্যা,
আছে ঘর আছে ঘরকন্যা।
তারি মধ্যে রেখেছ একটুখানি ফাঁক।
সেথা হতে পশে কানে বাহিরের দুর্বলের ডাক।
নিয়ে এসো শুশ্রূষার ডালি,
স্নেহ দাও ঢালি।
সে জীবনলক্ষ্মীর মনে পালনের শক্তি বহমান
নারী তুমি নিত্য শোনো তাহারি আহ্বান।
সৃষ্টি বিধাতার
নিয়েছ কর্মের ভার,
তুমি নারী
তাহারি আপন সহকার।....." ১৩

নারীর এই স্নেহময়ী, সেবাময়ী ও প্রেমময়ী রূপের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ উচ্চভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। এই কল্যাণময়ী নারীর যখন অবমাননা ঘটে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন তখন ব্যথিত হয়। তখন তিনি তাঁর অমর লেখনীর স্পর্শে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কাব্যে, প্রবন্ধে, নাটকে, উপন্যাসে ও ছোটগল্পে কবির প্রতিবাদী চেতনার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুলি সম্পর্কে একসময় বলেছিলেন যে গল্পগুলিতে বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি প্রথম ধরা পড়েছে। পুরুষ তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক নারীদের শোষণ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও অবমাননার রূপটি তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দেনাপাওনা' গল্পে। বঞ্চনা থেকেই নারীরা ক্রমে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

পণপ্রথা সমাজ জীবনের একটি দুষ্ট ক্ষত। এই প্রথার বিষময় ফল হিসেবে বঙ্গদেশের কতশত নারী অকালে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। একবিংশ শতাব্দীর দুরারোগ্য ভয়ঙ্কর ব্যাধির ভয়াবহতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ মতবাদ, 'এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নেই। জীবনের সর্বপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারী দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয় শ্রেণিতে গণ্য হইবে, আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে, নির্মমভাবে

দরদাম করিতে থাকা এমন দুঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই, সে সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে''। ১৪

বিবাহ নামক পবিত্র সামাজিক সংস্কারটিকে কেন্দ্র করে ঘৃণ্যতম ব্যবসা-ফাঁদা এবং তার ভয়াবহ পরিণতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে 'দেনাপাওনা' গল্পে। এই গল্পের কেন্দ্রে আছে মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উঠে আসা এক অসহায়া নারী চরিত্র, যার নাম নিরুপমা। বধূ নির্যাতনের এটি একটি নির্মম চিত্র। দরিদ্র পিতা রামসুন্দর মিত্রের কন্যা নিরুপমার বিবাহ স্থির হয়েছে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পাত্র হিসাবে রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রকে হাত ছাড়া করতে চায়নি রামসুন্দর। অপেক্ষাকৃত অভিজাত বংশে বেশি পণ দেবার সম্মতি দিলেও বিবাহ বাসরে পণের টাকা জোগাড় করতে না পেরে নিরুপমার জীবনে শুরু হয় মানসিক বিড়ম্বনা। নিরুপমার মত মেয়েকে তার অর্থলোভী শ্বশুর-শাশুড়ি বুঝতে চেষ্টা করেনি। শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার-অনাদর-অনাহার-উপেক্ষা ও অযত্ন পেয়েও পিতাকে দৃঢ়ভাবে পণ দিতে নিষেধ করেছে, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্না, নিরুপমা হয়ে উঠেছে বিদ্রোহিণী — "বাবা তুমি যদি আর এক পয়সাও আমার শ্বশুরকে দাও, তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পারবেনা, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।" ১৫

বাবার টাকার অঙ্কে মেয়ের মূল্য নির্ণয় করেছে রায়বাহাদুর। পণের টাকা সম্পূর্ণ দিতে পারেনি বলে নিরুপমার শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে পিতৃগৃহে যেতে দেয়নি। শেষে ভিটে বাড়ি সব বিক্রি করে শ্বশুরের সব ঋণ শোধ করে রামসুন্দর নিরুপমাকে নিতে এসেছিল। সেসময়ও নিরুপমার বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ভাষা রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুনিয়েছেন —

"টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোন মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না।"

নিরুপমার আরও জানিয়েছে — "আমার স্বামীতো এ টাকা চান না।"

পণপ্রথার বিরুদ্ধে নিরুপমার এই সংলাপগুলি আমাদের মনে রেখাপাত করে। ধীরে ধীরে বিনা চিকিৎসায় অবহেলায়, উপেক্ষায় ও নিজের শরীরের উপর যত্ন না নেওয়ায় অকালে ঝড়ে যেতে হল নিরুপমাকে।

তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে কত সমারোহ! চন্দনকাঠের চিতা সাজানো হল, ঘটা করে শ্রাদ্ধ হল। রায়বাহাদুর তার পুত্রকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে মনস্থ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন নিম্নোক্ত সংলাপে —

"এবার বিশহাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।"

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন — "আধুনিককালের ভদ্র বাঙালির ঘরের এই নির্মম

হৃদয়হীনতার পরিচয় সাহিত্যে এই প্রথম।" ১৬

এরূপ বধূ নির্যাতনের আরেকটি গল্প হল- 'শাস্তি'। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি অত্যাচারের একটি জীবন্ত চিত্র 'শাস্তি' গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। এই গল্পের নায়িকা চন্দরা। চন্দরা এই গল্পে জানিয়েছে ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। কুরি পরিবারের দুখীরাম ছিদাম ও তাদের দুই স্ত্রী রাধা ও চন্দরাকে নিয়ে অভাবের সংসার। পরিবারের নিত্যকলহের মূলে রয়েছে দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা। একদিন দুখীরাম সারাদিন বেগার খেটে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে আসে। দুখীরাম বড় বৌ রাধাকে ভাত দিতে বলে কিন্তু তাদের ঘরে রান্নার উপযোগী এতটুকু চালও ছিল না। এজন্য রাধা দুখীরামকে ভাত দিতে পারে নি। দুখীরাম একথা সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীর মাথায় দা দিয়ে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে বড় বউ রাধার মৃত্যু ঘটে। এসময় রামলোচন খুড়ো বাড়িতে এলে ছিদাম দুখীরামকে বাঁচাবার জন্য রামলোচনকে বলে — "ঝগড়া করিয়া ছোট বউ বড় বউ এর মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

এই সংবাদ রামলোচনের মাধ্যমে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ছিদাম স্ত্রী চন্দরাকে এই মিথ্যে অপবাদ ঘাড়ে নিতে বলে, এবং চন্দরাকে আশ্বাস দিয়ে বলে-"যাহা বলিতেছি তাই কর, তোর কোন ভয় নাই আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।" পুরুষশাসিত সমাজের একটি গর্হিত অপরাধ এইভাবে নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ নির্দোষ চন্দরাকে খুনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। স্বামীর এই নিষ্ঠুর আচরণে চন্দরার অন্তর অভিমানে ধিক্কারে ঘৃণায় প্রতিবাদে ভরে গেল। যে স্বামী তার স্বীকারোক্তি বিষয়ে চন্দরাকে শিখিয়েছিল যে সে তার বড় জা যখন বটি দা নিয়ে তাকে মারতে এসেছিল তখন দা দিয়ে তা ঠেকাতে গিয়ে কেমন করে লেগে গেছে তা বুঝতে পারে নি। অভিমানাহত চন্দরা একটি বারের জন্যও সেকথা বলেনি। পুলিশ দারোগা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হাকিম ও জজকে সে বলেছে-"আমি খুন করেছি।"

তার কাছে তুচ্ছ জীবন রাখার ইচ্ছা প্রকাশ পায়নি বরং মৃত্যুই তার কাছে অনেকবেশি সম্মানের মনে করে বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ। ফাঁসীর আদেশ হবার পর স্বামীকে মৃত্যুর আগে দেখতে চায় কিনা, এর উত্তরে চন্দরা একটি কথাই বলেছিল-'মরণ!' এই শব্দের উচ্চারণের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই 'শাস্তি' গল্পে স্বামীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'অপরিচিতা' রবীন্দ্রনাথের একটি সার্থক প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে তিনি পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। গল্পটিতে আমরা লক্ষ করি বরপক্ষ বিয়ের আসরে পৌঁছে গেছে। পূর্ব চুক্তি মত কন্যাপক্ষ একাধিক যৌতুক ও দানসামগ্রী ঠিক-ঠাক মতো দিয়েছে কিনা তা যাচাই করতে গিয়ে বরের মামা পাত্রীর গায়ের স্বর্ণালঙ্কার খুলে নিয়ে ওজন করতে বসেছে। এই অবিশ্বাস্য

ঘটনায় পাত্রসহ বরপক্ষের কেউ-ই প্রতিবাদ জানায়নি বরং পরোক্ষভাবে তা সমর্থন করেছে। কন্যাপক্ষ তাদের শর্ত অনুযায়ী যতটুকু স্বর্ণালঙ্কার দেবার কথা ছিল তার এক রতিও কম দেয়নি বরং আরও বেশি দিয়েছিল। সেই অলঙ্কারগুলি ছিল প্রত্যেকটি খাঁটি সোনায় তৈরি। কিন্তু বরপক্ষ কন্যাকে আশীর্বাদের জন্য যে স্বর্ণালঙ্কার দিয়েছিল তাতে সোনার ভাগ ছিল খুবই কম। কনের বেলায় নকল সোনা দেওয়ায় কনেপক্ষ কোনোরূপ প্রতিবাদ জানায়নি। শম্ভুনাথবাবু তার কন্যার বিয়েতে বরপক্ষের এরূপ আচরণের জন্য প্রীত হননি বরং তাদের প্রতি ঘৃণা মনোভাব পোষণ করেছেন। তিনি বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়নের কোনোরূপ ত্রুটি করেননি। কিন্তু বরপক্ষের বিশ্বস্ততার অভাবজনিত কারণে তিনি কন্যাকে সম্প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কল্যাণীও বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করতে পেরেছিল, — "আমি বিবাহ করিব না।"

পণপ্রথার বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিবাদ জানিয়ে শম্ভুনাথ যে সাহসের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা নিঃসন্দেহে অর্থলোভী বরপক্ষের শিক্ষার বিষয়।

'হৈমন্তী' নারী অবমাননার বিরুদ্ধে একটি সার্থক প্রতিবাদী গল্প। পাত্রপক্ষের অমানবিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষিতা হৈমন্তী প্রতিবাদ জানিয়েছে। বয়স একটু বেশি বলে কন্যার বিয়েতে গৌরীশংকর পণের টাকা বেশি দিয়েছেন। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি পুত্রবধূ হৈমন্তীর বেশি বয়সটাকেই ত্রুটি বলে ধরে নিয়ে তার ওপর অবিচার করেছে। হৈমন্তী ছিল গৌরীশংকরের একমাত্র কন্যা। সুতরাং চাকুরে হওয়ার সুবাদে তার বাবার ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত আছে এসংবাদ পেয়েছিল ছেলের বাবা। এসংবাদ শোনার পর হৈমন্তীকে আদর-আপ্যায়নে কোন ত্রুটি করেনি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কন্যার পিতা উচ্চসুদে ঋণ নিয়ে পণ মিটিয়েছে। লাখ টাকার গুজব যে সম্পূর্ণ ফাঁকিতে পরিণত হয়েছে এটা ভেবে শ্বশুর-শাশুড়ি পুত্রবধূর ওপর বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছে। আত্মীয়রা হৈমন্তীর বয়স জিজ্ঞেস করলে হৈমন্তী সত্য কথাই জানিয়েছে। শাশুড়ির নির্দেশমতো কম বয়স বলে মিথ্যে কথা বলেনি। তার সুশিক্ষা, রুচিবোধ, সেবাযত্ন ও সকলের প্রতি একটি স্নিগ্ধ মনোভাবের মূল্য শ্বশুরবাড়িতে দেয়নি।

হৈমন্তী পিতার কাছ থেকে মহৎ গুণগুলো শিক্ষা লাভ করেছিল। পিতার মতো সে হয়ে উঠেছিল বলিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা, উদার ও সত্যবাদিতার প্রতীক। অথচ শ্বশুর-শাশুড়ির নীচতা, ক্ষুদ্রতা, যখন বেড়ে যাচ্ছিল হৈমন্তী তখন স্বেচ্ছায় তিলে-তিলে আত্মহত্যার পথকেই বেছে নেয়। তার বর সবকিছু জেনেও এতটুকু প্রতিবাদ করেনি।

হৈমন্তীর স্বামীর মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন, —

"স্ত্রীকে লইয়া জোর কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহু যুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জান তোমরা ? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। শুনিতেছি মা পাত্রীর সন্ধান

10 MAY 2013
250618
LIBRARY

করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ, আর কাজ কি?"

রবীন্দ্রনাথ এরূপ গৃহবধূর ওপর অত্যাচার বিষয়ে স্বামীর নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এজন্য সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথ হৈমন্তীর নামটি পর্যন্ত গল্পে উল্লেখ করেননি। এরপর গৌরীশংকর তার কন্যাকে দেখতে এলে অভিমানবশত হৈমন্তী তার বাবাকে জানাল, —

"বাবা, আর যদি কখনো তুমি দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়ীতে আসো তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"

— মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হৈমন্তীর এই বক্তব্যে ধরা পড়ে পিতার অপমান আসলে তারই অপমান।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে নারীর অপমান, অসম্মানের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে। মৃণাল একটি বিদ্রোহিণী চরিত্র সে দীর্ঘ পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবনকে ছিন্ন করে দিতে চেয়েছে। কেননা পরিবারে তার অবস্থান শুধুমাত্র কর্তব্য ও দেনাপাওনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই দেনাপাওনার হিসাব একটু ভিন্ন প্রকারের। পুরুষশাসিত সমাজের স্বার্থপরতা থেকে মৃণাল মুক্তি চেয়েছিল। বিন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় হওয়ার পর তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। তখন সে বিদ্রোহী মনোভাব ব্যক্ত করেছে। বিন্দু মুক্তি পেতে চেয়েছে যন্ত্রণাময় এই সংসার থেকে। পরিশেষে পুরুষ সমাজকে ধিক্কার দিয়ে সে বলেছে,- "মেয়েদের কাপড়ে আগুন দিয়ে মরা একটা ফ্যাশন হয়েছে।"

বিন্দুর আত্মহনন কোনো পলায়ন মনোবৃত্তি নয়, নির্যাতিতা নারীর দৃপ্ত প্রতিবাদ। অসম্মান, করুণার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকা মৃণালের অসহ্য মনে হয়েছে। একদিন সে তার স্বামী-সংসার ছেড়ে চলে গেছে শ্রীক্ষেত্রে। সেখান থেকে সে চিঠিতে লিখেছে- "আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।" এবং তাঁর শেষ উক্তি — "আমিও বাঁচব।" -এর মধ্যে নারীমুক্তির পরিচয় মেলে।

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পেও আছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে উপেক্ষার প্রসঙ্গ। এ গল্পে ভূপতি একটি ইংরেজী সাময়িক পত্রের সম্পাদক। পত্রিকা সম্পাদনের কাজে সে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকে। তার স্ত্রী চারুলতা সন্তানহীনা। ভূপতি স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা, দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেনি। এজন্য চারুলতা নিজেকে প্রতিনিয়ত সঙ্গীহারা বলে মনে করত। অন্তঃপুরে বন্দিনী চারু নিঃসঙ্গতায় হাঁপিয়ে ওঠে। এই অবসরে অমলকে কেন্দ্র করে সে এক স্বপ্নের জগৎ গড়ে তুলেছিল। বাগান তৈরীর পরিকল্পনা, সাহিত্যচর্চা এগুলির মধ্যে দিয়েই অমল ও চারুর মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠেছিল। তাতে তাদের মধ্যে কোনো অপরাধবোধ তৈরী হয়নি। চারুর অন্তরে দেওর অমলের

জন্য যতটুকু স্থান ছিল অমলের স্বেচ্ছাবিদায়ের দিনে তা এক ট্র্যাজিক পরিণতি বহন করে এনেছিল। চারুর সঙ্গে ভূপতির সামাজিক বন্ধন ঘটেছে, কিন্তু মানসিক বন্ধন ঘটেনি। ভূপতির বক্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য —

"যে নারী অন্তরের মধ্যে মৃত প্রেমের মাধুরী বহন করে, সংসার তার পক্ষে কত দুঃসহ, স্বামী তার কত বড় বন্ধন, আর সেই নিস্তব্ধ শোক পরায়ণা নারীকে ভালবাসা স্বামীর পক্ষে কত কঠিন।"

— এক্ষেত্রে পুরুষকে চিরকাল —"যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছে তাহার ভাঙা ইঁট কাঠগুলো ফেলিয়া যাইতে পারিবনা। কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে।"

— এই গল্পে আত্মীয়ের সঙ্গে প্রেমসমস্যা এবং তাকে কেন্দ্র করে জটিলতা দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে বিবাহিতা নারীর স্বাধীন প্রেম সমাজের চোখে নিন্দনীয়। এদিক থেকে 'নষ্টনীড়' গল্পটি একটি সমাজবিদ্রোহমূলক সার্থক গল্প।

'পয়লা নম্বর' রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পের নায়িকা অনিলা একটি বিদ্রোহিণী নারী। সে তার স্বামী অদ্বৈতচরণের কাছ থেকে কোনদিনও স্ত্রীর মর্যাদা পায়নি। অদ্বৈত তার দল ও পড়াশুনা নিয়ে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত। স্ত্রীর চাওয়া-পাওয়া. আনন্দ, হাসি, গানের প্রতি কোন দৃষ্টি তার ছিল না। স্ত্রীর ভালো-মন্দের খবর সে কোনদিন রাখেনি। একদিকে স্বামীর অবহেলা, অন্যদিকে প্রতিবেশী সিতাংশুর লুব্ধ দৃষ্টি এই দুই অবমাননা থেকে মুক্তিলাভের জন্য দু'জনকেই চিঠি লিখে অনিলা স্বামীগৃহ থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। চিঠির বক্তব্য —

"আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না, খুঁজে পাবে না।"

— অনিলার এই বন্ধনমুক্তির বাসনা নিঃসন্দেহে পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে একটি প্রদীপ্ত প্রতিবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

'পাত্রপাত্রী' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। এই বন্ধনে আবদ্ধ হবার ব্যাপারে পাত্র ও পাত্রীর পছন্দ অপছন্দের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যখন পাত্রের বাবা পাত্রকে না জানিয়েই বিবাহ স্থির করে ফেলে তখনই শুরু হয় পিতা ও পুত্রের মধ্যে মতান্তর। গল্পের নায়ক সনৎকুমার। সে পন্ডিত মশায়ের মেয়ে কাশীশ্বরীকে বিয়ে করতে চেয়েছে। এর পেছনে বাল্যপ্রণয় প্রসঙ্গটি জড়িত। সনৎকুমারের মা আন্তরিকভাবে চেয়েছিল কাশীশ্বরীর সঙ্গেই ছেলের বিয়ে হোক। কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে বাধ সাধলেন সনৎকুমারের বাবা। তিনি ছেলের বিয়ে তো ভেঙে দিলেনই এমনকি পন্ডিত মশাইকেও দেশছাড়া করলেন। এরপর সনৎকুমার এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তার বাবা এক সম্পন্ন পরিবারের শুচিবায়ুগ্রস্তা কন্যার সাথে তার বিবাহ স্থির করে। সনৎকুমার কিন্তু তার পিতার মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। এতে পিতা পুত্রের মধ্যে বিরোধ

সৃষ্টি হয়। সনৎকুমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। পরিশেষে সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য ব্যবসার কাজে নেমে পড়ে। এদিকে তার যৌবন অতিক্রান্ত। প্রৌঢ় বয়সে তার একটি সঙ্গিনীর প্রয়োজন অনুভব করে সে এক হেডমাস্টারের কন্যাকে বিয়ে করে নেয়।

রবীন্দ্রনাথ 'পাত্রপাত্রী' গল্পে আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বক্ষ্যমান গল্পে ব্যক্তির বিরুদ্ধে জানিয়েছেন প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের 'ম্যানেজারবাবু' একটি প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পটি 'গল্প-সল্প' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। ম্যানেজারবাবু হলেন জমিদারের নায়েব। তিনি অত্যাচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তৎকালে পুণ্যাহের দিনে প্রতিটি প্রজাকেই ভেট নিয়ে আসতে হত। যারা দরিদ্র প্রজা তাদের পক্ষে জমিদারদের বাৎসরিক খাজনা আদায়ের দিনে ভেট দেওয়া সাধ্যের অতীত ছিল।

ম্যানেজারবাবু পুণ্যাহের দিনে দুধ স্নান করবার ইচ্ছে প্রকাশ করল, সে নিজেকে প্রজাদের চেয়ে উর্ধ্বে এবং অসাধারণ ভাবত। এক গোয়ালা তার নির্দেশ মত ঘড়া ঘড়া দুধ এনে দেয়। ম্যানেজারের হুকুম সে অমান্য করেনি, আপাত দৃষ্টিতে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না থাকলেও পরোক্ষভাবে পাঠক মনে এধরনের দাম্ভিক ম্যানেজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চেতনা জাগিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

'ত্যাগ' গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পিতা হরিহর পুত্র হেমন্তকে কুসুম নামে একজন বাল্যবিধবার সঙ্গে বিয়ে দেয়। হরিহর কুলীন ব্রাহ্মণ, সে জানত না কুসুম বাল্যবিধবা শূদ্রকন্যা। এব্যাপারে প্যারীশঙ্করের সক্রিয়তা ছিল। এই সত্যঘটনা প্রকাশ হবার পর রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হরিহর রেগে যায়। ব্রাহ্মণের জাত নষ্ট করে সমাজের নীতি লঙ্ঘনের জন্য হরিহর তার পুত্রের উপর গর্জন করে জানাল —

"হেমন্ত বউকে এখনই বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও।"

— হেমন্ত কিন্তু বাবার কথা রাখেনি কেননা হেমন্তের সঙ্গে কুসুমের ছিল বাল্য প্রণয়। আর বিয়েটাও হয়েছিল তার পিতার ইচ্ছাতেই। সুতরাং হেমন্ত উপলবিদ্ধ করেছে, "সেই ভালোবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর !" সমাজ যেমনি একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালোবাসা চূর্ণ হইয়া একমুষ্টি ধূলি হইয়া গেল। ওদিকে পুনরায় হরিহর মুখুজ্যে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন- "অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে আর সময় দিতে পারিনা। মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও।"

— "আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।"

হরিহর কুসুমকে পুত্রবধূর সম্মানসূচক ভাষা প্রয়োগ না করে তাচ্ছিল্য ভ'রে 'মেয়েটা' শব্দ উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু হেমন্ত স্ত্রীকে সম্মানসূচক শব্দ প্রয়োগ করেছে। পিতা ও পুত্রের এখানেই বৈপরীত্য। হরিহরের তর্জন-গর্জন তখনো থামেনি। - জাত খোয়াইবি?

".....আমি জাত মানিনা।"

পিতার বিরুদ্ধে ছেলের এই প্রতিবাদপ্রবণ মানসিকতার মধ্যে হেমন্তের ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে। সে ভীরু ও নিষ্ক্রিয় চরিত্র নয়। তার বিবেকবোধ ছিল বলেই পিতার অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তার কাছে জাতপাতের উর্ধ্বে উদার মানবতার ধর্মই প্রধান হয়ে উঠেছে। অন্তঃসারশূন্য এই সামাজিক রীতিকে সে মেনে নিতে পারেনি।

কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখা সার্থক গল্প 'মহামায়া'। মহামায়া কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা। অকুলীন ব্রাহ্মণ রাজীব ছিল মহামায়ার বাল্য সঙ্গী। সে তার বংশগৌরবের অভিমানে যে রাজীবের প্রেমের মূল্য দেয়নি সেই মহামায়াই বংশগৌরবের কথা ভুলে গিয়ে বলেছে - "মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।"

কৌলীন্য অকৌলীন্যের প্রশ্ন মহামায়ার কাছে নিতান্ত গৌণ। তার রক্ষণশীল বড় ভাই ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায় রাজীবের সঙ্গে মহামায়ার বিয়ে না দিয়ে ঘাটের মরার মত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে মহামায়ার বিয়ে দিল। বিয়ের পরের দিনই মহামায়ার স্বামীর মৃত্যু হল। তৎকালীন নিয়মানুসারে বিধবা ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হয়। কাঠ, ঘি, দিয়ে মৃত স্বামীর পাশে জীবিত অবস্থায় মহামায়াকে তুলে দেওয়া হয়। চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই সময় প্রবল বর্ষণে চিতার আগুন যায় নিভে। সেই দগ্ধ অবস্থায় মহামায়া সামাজিক নিয়মকে উপেক্ষা করে চলে আসে রাজীবের গৃহে।

আলোচ্য গল্পে রবীন্দ্রনাথ কৌলীন্য প্রথাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন।

'মানভঞ্জন' গল্পের নায়িকা গিরিবালা সে তার স্বামীর উপেক্ষার পাত্রী। স্বামী তাকে স্ত্রী হিসেবে কোন মর্যাদা দেয়নি। গিরিবালা পুরুষের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু স্বামীর এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিরিবালা প্রতিবাদ জানিয়েছে। গিরিবালা অভিনেত্রী হয়ে যখন যথার্থ অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়ে বহু শ্রোতা ও দর্শকের কাছে অভিনন্দিত হয়েছে তখন সে বুঝল সে স্বামীর উপেক্ষার পাত্র হলেও অপরের কাছে সে একান্ত প্রিয়। সমাজে তার মূল্য যথেষ্ট। অভিনেত্রী হয়ে সে বহু পুরুষকে বশীভূত করতে পারে। সে আপন ভাগ্য জয় করে নিতে পেরেছে। ব্যক্তির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ 'মানভঞ্জন' গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং সংসার নামক গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে এসে একজন নারী যে নিজ সত্তাকে বিকশিত করে সমাজের প্রিয় হয়ে উঠতে পারে সেটাও এখানে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন।

'দুরাশা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ জাত-পাতের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন, ব্রাহ্মণ্য অহংকারকেও ভেঙে দিতে চেয়েছেন। সিপাহী বিদ্রোহকালে বদ্রাওনের নবাবের ফৌজের হিন্দু অধিনায়কের নাম ছিল কেশরলাল। কেশরলাল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তার আচার নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়েছিল নবাবপুত্রী। যখন নবাব ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেশরলালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার

করেছিল সে সময় কেশরলাল তা বুঝতে পেরে নবাব মহল ত্যাগ করে। নবাবপুত্রী পিতার এই আচরণকে ভালোচোখে দেখেনি। সে কেশরলালের কাছে তার সমস্ত গহনা পাঠিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে ইংরেজরা কেশরলালের বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। কেশরলাল বাহিনী অপ্রস্তুত যুদ্ধে পরাজিত হয়। নবাবপুত্রী তার পিত্রালয় ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। আহত অবস্থায় নবাবপুত্রী কেশরলালের মুখে জল দেয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এসে কেশরলাল নবাবপুত্রীকে বিধর্মী বলে তিরস্কার করে চলে যায়। গৃহত্যাগী নবাবপুত্রীও বের হয়ে পড়ে অজানার পথে। নবাবপুত্রী ছিল সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী। প্রেমের কাছে জাত-পাত মূল্যহীন বলে সে মনে করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বশত কেশরলাল এই প্রেমের মূল্য দেয়নি। দীর্ঘকাল পর নবাবপুত্রী যখন কেশরলালের সাক্ষাৎ পেয়েছিল তখন তার অবরুদ্ধ হৃদয় বাধা মানেনি, কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। সে দেখলো কেশরলাল বিবাহিত একটি ভুটিয়া বস্তিতে স্ত্রীকে নিয়ে সংসারজীবন যাপন করছে। এই দৃশ্যটি নবাবপুত্রীর কাছে ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক, - "আমি জানিতাম ধর্ম অনাদি অনন্ত.....হায় ব্রাহ্মণ তুমিতো তোমার এই অভ্যাসের পরিবর্তে আরেক অভ্যাস লাভ করিয়াছ। আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আরেক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।" কেশরলালকে পাবার জন্য তার যে নিরলস সাধনা যার দ্বারা সে মুসলমান থেকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয়েছে তার সবটাই কেশরলালের পরিণতি দেখে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' একটি উৎকৃষ্ট প্রতিবাদী চেতনামূলক গল্প। এই গল্পে কন্যাপক্ষের প্রতি বর পক্ষের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

যজ্ঞেশ্বরের সুরূপা কন্যা কমলা। বিভূতিভূষণ দরিদ্র যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এই বিয়েতে বিভূতিভূষণের পিতার সম্মতি ছিলনা। ধনগর্বে গর্বিত হয়ে তার পিতা যজ্ঞেশ্বরকে অপদস্থ করবার জন্য মতলব আঁটলো। বিয়ের দিনে বরযাত্রীসহ বরকর্তা যজ্ঞেশ্বরের গৃহে উপস্থিত। সাধ্যমত বরযাত্রীদের আদর, আপ্যায়ন করলেও প্রবল বর্ষণের ফলে বরযাত্রী সংবর্ধনায় কিছুটা ত্রুটি থেকে যায়। যেখানে আহারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সে স্থানটি হয় জলমগ্ন। খাদ্য পরিবেশনকালে পাত্রের পিতার অঙ্গুলি নির্দেশে বরযাত্রীদের খাদ্যবস্তুর মধ্যে কাঁদা ছিটিয়ে দিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠল একদল। এরূপ আচরণের জন্য যজ্ঞেশ্বরের চোখে এল জল। বিয়ে পণ্ড হয়ে যাবার উপক্রম হলে বিভূতি তার পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে - "বাবা আমাদের এ কিরকম ব্যবহার।"

এরপর খাদ্য পরিবেশনের কাজে বিভূতি নিজে অংশ গ্রহণ করে। তার বাবাকেও সে খাদ্য পরিবেশন করে। বিভূতিভূষণের উদারতা ও দৃঢ় সংকল্পের জন্য কমলার সঙ্গে তার বিবাহের মিলন-মধুর পরিবেশ রচিত হয়। বিভূতির ব্যক্তিত্বের ফলে তার পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে

পেরেছে। পিতার মতের বিরুদ্ধে বিভূতির এই সক্রিয়তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

'পুত্রযজ্ঞ' রবীন্দ্রনাথের একটি প্রথম শ্রেণির গল্প। নিরাপরাধী স্ত্রী বিনোদিনী এই গল্পের নায়িকা, নায়ক বৈদ্যনাথ। একে একটি নিষ্ঠুর কাহিনী বলা যেতে পারে। নারীজাতির অবমাননা মূলক গল্পগুলির মধ্যে এই গল্পটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বৈদ্যনাথ চেয়েছিল বিনোদিনীর গর্ভে একটি সন্তান আসুক। সন্তানসম্ভবা বিনোদিনীকে বৈদ্যনাথ চরিত্রদোষ দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। নিরুপায় বিনোদিনী অন্তঃসত্তা অবস্থায় চলে যায়, এবং তার একটি পুত্র সন্তান হয়। এদিকে বৈদ্যনাথ একাধিক বার বিয়ে করেছে। কিন্তু তার ভাগ্যে পুত্রমুখ দর্শন হয়নি। পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টী যজ্ঞের আয়োজন করে। সাধু সন্ন্যাসীদের আহারাদির ব্যবস্থা করে। ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথ গ্রাম থেকে শহরে এসে অবস্থাপন্ন হয়ে ওঠে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সেসময় গ্রামের সাধারণ মানুষ খাদ্যের প্রত্যাশায় শহরে এসে ভিড় জমায়। বিনোদিনীও তার ক্ষুধার্ত শিশুপুত্রকে নিয়ে বৈদ্যনাথের গৃহের অভ্যন্তরে যাবার জন্য ঢুকেছিল। ক্ষুধায় কাতর স্ত্রী লোকটি অত্যন্ত করুণভাবে জানালো - "ওগো এই ছেলেটিকে দুটি খেতে দাও। আমি কিছু চাইনে।" বৈদ্যনাথের গৃহের গুরুদয়াল এসে সেই বালকটিকে এবং তার মাকে তাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত করে দিল। আসলে এই ক্ষুধার্ত বালকটিই যে বৈদ্যনাথের পুত্র বুঝতে পারলো না। রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন —

"একশত পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথকে পুত্রপ্রাপ্তির দুরাশায় প্রলুব্ধ করিয়া তাহার অন্ন খাইতে লাগিল।"

যে পিতা পুত্র কামনায় পুত্রযজ্ঞের আয়োজন করেছিল তারই পুত্রকে নিতান্ত অবহেলায় বিতাড়িত করার মধ্যে যে অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণের পরিচয় দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্তিনী' গল্পটি মনস্তত্ত্বমূলক হলেও এর মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছে প্রতিবাদের সুর। বহুবিবাহের বিষময় ফল এই গল্পে প্রতিফলিত। এই গল্পে আমরা দেখি নিবারণ ও হরসুন্দরী দুই নায়ক নায়িকার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু কোন সন্তানের আবির্ভাব হয়নি। পুত্র সুখে সুখী করতে হরসুন্দরী বালিকা শৈলবালার সঙ্গে তার স্বামীর বিয়ে দেয়। বিয়ের পর নিবারণ তার তরুণী ভার্যাকে নিয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করে। দ্বিতীয় পত্নীর মন রাখার জন্য মিতব্যয়ী নিবারণ ঋণগ্রস্ত হয়। এই ঋণের টাকা মেটাতে সে অসৎপথে পা বাড়ায়, অফিসের টাকা আত্মসাৎ করে। এই অভিযোগে যদিও তাকে পুলিশে দেওয়া হয়নি কিন্তু দুদিনের মধ্যে সবটাকা ফেরৎ দিতে হবে একথা স্বীকার করিয়ে নেওয়া হয়। এই অবস্থায় গহনা লোভী শৈলবালাকে পূর্বেই হরসুন্দরী সব গহনা দিয়ে দিয়েছিল। নিবারণের এই দুঃসময়ে হরসুন্দরী ও নিবারণ দুজনেই শৈলবালাকে অনুনয় বিনয় প্রার্থনা ও শেষে ভয় দেখালেও বিপদের দিনে একরতি সোনা দিয়েও নিবারণের সম্মান রক্ষায় সহযোগিতা করেনি।

তারপর বাড়ি বিক্রি করে নিবারণ সেই ঋণ পরিশোধ করে এবং আশ্রয় নেয় একটি ভাড়া বাড়িতে। ইতিমধ্যে শৈলবালা গর্ভবতী হয় এবং সে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়, হরসুন্দরী তখন দিবারাত্রি শৈলবালাকে সেবা শুশ্রূষা করে বাঁচাতে চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারেনি। কিন্তু শৈলবালার মৃত্যু পর উভয়ের মধ্যে বিভাজন রেখা তৈরি হয়, তাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরে, শৈলবালা মধ্যবর্তিনী হয়েই থেকে যায়। হরসুন্দরীকে যখন শৈলবালার দাসী হয়ে থাকতে হয়েছিল সেই বেদনা হরসুন্দরী কখনো ভুলতে পারেনি। যদিও শৈলবালার প্রতি হরসুন্দরীর কোন অভিযোগ ছিলনা। সারা জীবন ধরে নিবারণের গৃহে জাঁতাকলে পেশাই হয়েছে মাত্র। শৈলবালাকে নিবারণ যতটা ভালোবেসেছে তার সিকিভাগ ভালোবাসাও সে পায়নি, এটাই তার অভিমান। এভাবে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গল্পে অভিমানাহত হরসুন্দরীর পক্ষ অবলম্বন করে বহুবিবাহ নামক কুপ্রথার প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। বনোয়ারীলাল প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছে যা অনেকটা বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। পিতা মনোহর দরিদ্র প্রজা মধু কৈবর্ত্যের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। মনোহরলালের বিশ্বস্ত ভৃত্য নীলকণ্ঠকে বিষয়-আশয় ও জমিদারের কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করেছে। কিন্তু তার পুত্রকে সে দায়িত্ব দেয়নি। বনোয়ারি ছিল প্রচলিত প্রথাধর্মের বিরোধী। সে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলেই কারো দাসত্ব স্বীকার করতে চায়নি। পিতা তাকে মাসোহারা দিতে চাইলে সে তা গ্রহণ করেনি। মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তার স্ত্রী কিরণ ও ভাই বংশধর পরগাছার মতো হয়ে বেঁচেছিল, যা বনোয়ারির পছন্দ হয়নি। একসময় কিরণ ও বংশীকে সে ভালোবাসত। কিন্তু বনোয়ারি দেখল কিরণ ও বংশী হালদার গোষ্ঠীর কেউ নয়। ব্যক্তি নয়, পরিবারের অংশ তারা। এই কারণে বনোয়ারি সেই পরিবার থেকে বেরিয়ে এসেছে। এমনকি সে তার পিতার মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করেনি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, — "যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য মানুষ যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই....."

'সংসারের ছোটো কুন্‌কের মাপের বাঁধা বরাদ্দে বংশী, কিরণ ইত্যাদিদের বেশ চলিয়া যায়। কিন্তু বনোয়ারির মতো এক-একজন মানুষের কিছুতেই ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষীশাবকের মতো কেবলমাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্যের রসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে।"

পারিবারিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে তথা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বনোয়ারী তথা ব্যক্তির প্রতিবাদ

আধুনিক পরিচয় বহন করে।

'রবিবার' গল্পেও আমরা দেখি পারিবারিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির প্রতিবাদ। এই গল্পের নায়ক অভীক। স্বাধীনচেতা অভীক তাদের বংশগত আচার মেনে নেয়নি। পারিবারিক কুলাচার ত্যাগ করে সে আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রকর গল্পেও রয়েছে প্রতিবাদ। এই গল্পের সত্যবতী একটি প্রধান নারীচরিত্র। সে ছিল বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। স্বামী মুকুন্দ তার চিত্র রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। এর পর মুকুন্দের অকাল মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর আগে তার কাকা গোবিন্দর হাতে স্ত্রী পুত্রের দায়-দায়িত্ব উইল করে দিয়ে যায়। গোবিন্দ সত্যবতীর শিল্পচর্চা ভালো চোখে দেখেনি। তার চোখে শিল্পচর্চা সময় ও অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। পুত্র চুনিলালও ভালো ছবি আঁকত। পুত্রের আঁকা একটি সুন্দর ছবি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললে সত্যবতী প্রতিবাদ জানায়, — "কেন তুমি চুনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে ? .....ও যদি পথের ভিক্ষুক হয় সেও ভালো। কিন্তু কোনদিন তোমার মত যেন না হয়। ভগবান ওকে যে সম্পদ দিয়েছেন তারই গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বের চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি মায়ের আশীর্বাদ।"

সত্যবতী শিল্পের অমর্যাদা সহ্য করতে পারেনি বলেই পুত্রের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হবার অনুকুল পরিবেশ পায়নি বলে পুত্রকে নিয়ে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

'বদনাম' গল্পটি প্রতিবাদী চেতনার সাক্ষ্য বহন করে। এ গল্পের নায়িকা সৌদামিনী একটি প্রতিবাদী নারীচরিত্র। তার স্বামী পুলিশ অফিসার যিনি তৎকালীন স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী নেতাদের গ্রেপ্তার করবার জন্য সচেষ্ট। তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিপ্লবী নেতা অনিল মিত্রকে গ্রেপ্তার করা। বিপ্লবী অনিল মিত্র যেদিন সৌদামিনীর গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল সেদিন স্বামী সৌদামিনীকে বিপ্লবীর সন্ধান দিতে বলেছিল। সৌদামিনী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় — "আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি তাই বলে কি পুলিশের চরের কাজ করব ? .....আমাদের দেশে দু-একজন সত্যিকারের পুরুষ দেখা যায়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব করে দেওয়া। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এসব সন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক্।" সৌদামিনীর অসহযোগিতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

'দুর্বুদ্ধি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মনুষ্যত্বহীন, শোষক, অত্যাচারী পুলিশরা সমাজের চোখে শ্রদ্ধার পাত্র নয়। ঘুষ নেওয়া তাদের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার। প্রতিনিয়ত এভাবে তারা অন্যায় করে যাচ্ছে। এই গল্পের অপ্রধান চরিত্র একজন নেটিভ ডাক্তার। দারোগার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে একদিন থানায় এসেছিল। সে দেখল সহায় সম্বলহীন, এক চাষী সর্পাঘাতে মৃত তার এক কন্যার দেহ নিয়ে এসেছিল থানায় রিপোর্ট করবার

জন্য। বেলা ১ টা থেকে থানায় এসে অপেক্ষা করছিল। দারোগাবাবুর দেখা সে পায়নি। প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে সন্ধ্যা অবধি লোকটিকে বসে থাকতে দেখে ডাক্তার চাষীটির কাছে শুনতে পেল, - "একবার কনস্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ট্যাকে কিছু আছে কিনা। সে উত্তর করিয়াছিল সে নিতান্তই গরীব, তাহার কিছু নাই, কনস্টেবল বলিয়া গেছে, থাক্ বেটা, তবে এখন বসিয়া থাক্।"

ঘুষ দেবার অর্থনৈতিক ক্ষমতা দরিদ্র চাষীটির ছিলনা বলেই কনস্টেবল তার দায়িত্বটুকু পালন করেনি। ডাক্তারবাবু এর প্রতিবাদ জানায়, "বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতেছেন আপনারা মানুষ না পিশাচ? এইবলে ডাক্তারবাবু তার গোটা দিনের উপার্জনের টাকা 'ঝনাৎ করিয়া' দারোগাবাবুর সামনে ফেলে দেন। আর বলেন টাকা চান তো এই নিন, যখন মরিবেন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন ও কন্যার সৎকার করিয়া আসুক।" ডাক্তারবাবু এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল বলে দারোগাবাবুর দৌরাত্ম্যে তাঁকে ভিটে ছাড়া হতে হয়েছিল। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মূলত দুর্বুদ্ধির ফল বহন করতে হল। এরূপ বাস্তবধর্মী ছোটগল্প রবীন্দ্রসাহিত্যে আর নেই বললেই চলে।

'মেঘ ও রৌদ্র' রবীন্দ্রনাথের একটি সফল প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। সমালোচকের মতে, "আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অরাজকতা, সামন্তশাসিত গ্রামবাংলায় নায়েব-গোমস্তার অন্যায় অত্যাচার, ষড়যন্ত্র, স্বজাতির ইংরেজদের তাবেদার হয়ে ওঠার চেষ্টা, সাধারণ গ্রামবাসী শ্রমজীবী পল্লীমানুষের দুর্বলতা যা তিনি বাস্তবে চারপাশে দেখেছিলেন তারই শিল্পিত রূপায়ন ঘটেছে গল্পে।"১৬

রবীন্দ্রনাথ জমিদার, নায়েব, পুলিশ,দারোগা, ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনকে ভালো চোখে দেখেননি। অত্যাচারী ইংরেজ প্রতিনিধিরা গ্রামীণ মানুষদের ওপর কীভাবে অত্যাচার করত তার বিবরণ এই গল্পে। শশিভূষণ ও গিরিবালার প্রেমের পাশাপাশি আলোচ্য গল্পে বিদেশী শাসকের মুখোশ রবীন্দ্রনাথ খুলে দিয়েছেন। এগল্পে আমরা দেখি গিরিবালার বাবা হরকুমারের ওপর অত্যাচারের চিত্র। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট শশিভূষণের গ্রামে এসে তাঁবু ফেলে। ম্যাজিস্ট্রেট নায়েব হরকুমারকে চার সের ঘি সংগ্রহ করতে বলে। হরকুমার তাতে ব্যর্থ হলে আদেশ হয়, "এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্বুর চারিধারে ঘোরদৌড় করাও।"

এধরনের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে হরকুমারকে। শশিভূষণ গিরিবালার বাবার এরূপ অপমান সহ্য করতে না পেরে ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মামলা দায়ের করে। হরকুমার সাক্ষ্য দেবার সময় জানায়, মামলা করবার ইচ্ছা তার ছিল না। একমাত্র শশিভূষণই তাকে উৎসাহিত করেছে মামলা করতে। এম. এ.বি.এল. পাশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শশিভূষণ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে মামলা মিটমাট করে নিতে বলেন। কিন্তু আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন শশিভূষণ তা অস্বীকার করে। গ্রাম ছেড়ে

যেদিন শশিভূষণ কোলকাতার দিকে যাত্রা করে সে সময় দেখল, নতুন স্টিমার লাইনে ম্যানেজার সাহেব কর্তৃক মহাজনের নৌকা ডুবানো এবং নদীর মোহনায় জেলার পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট কর্তৃক জেলেদের জাল নষ্টের চিত্র। এর বিরুদ্ধে শশিভূষণ প্রতিবাদ জানায়। এরপর পুলিশকর্তা শশিকে ইংরেজী ভাষায় গাল দিলে সে পুলিশকে আক্রমণ করে, এর ফলে শশিকে জেলে যেতে হয়। জেলে থাকাকালীন অবস্থায় শশিভূষণের বাবা পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে এলে শশিভূষণ বাবাকে কঠিন ভয়ঙ্কর নির্মম বাস্তব সত্য কথা বলে, "জেল ভালো। লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলেনা, কিন্তু জেলের বাইরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া ফেলে। আর যদি সৎ সঙ্গের কথা বলতো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী, কৃতঘ্ন, কাপুরুষের সংখ্যা অল্প কারণ স্থান পরিমিত, বাইরে অনেক বেশি।"

ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় বিচারের নামে প্রহসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সর্বোপরি মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষের গভীর বেদনাকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন।

'নামঞ্জুর' রবীন্দ্রনাথের একটি রাজনৈতিক গল্প। এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর দৃষ্টিতে গল্পটি লেখা হয়েছে। এক বিপ্লবীর দৃষ্টিতে অসহযোগ আন্দোলন বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্যে রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করেছেন লেখক। রাজনৈতিক কর্মীর মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে লেখক এই গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'চোরাইধর্ম' গল্পে নায়কের বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল ঠিকুজি কোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে নায়ককে লড়াই করতে হয়েছিল। যদিও এজন্য তাকে জালিয়াতির পথ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

হিন্দু ধর্ম ছিল আচার সর্বস্ব। এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদী গল্পের নাম 'মুসলমানীর গল্প।' হিন্দু সমাজের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে এই গল্পে। পাল্কীতে করে বংশীবদনের ভাইঝি কমলা যখন বিয়ে করতে যাচ্ছে তখন ডাকাতরা তাকে অপহরণ করে। হবির খাঁ কমলাকে উদ্ধার করে কাকার ঘরে কমলাকে ফিরিয়ে দিতে আসে। কিন্তু তার কাকা কমলাকে আশ্রয় দেয়নি। হবির খাঁ কমলাকে মা বলে সম্বোধন করে তার গৃহে হিন্দু রীতি অনুসরণে থাকবার ব্যবস্থা করে। হবির খাঁর পুত্র কমলাকে বিয়ে করতে চাইলে কমলা এই বিয়েতে সম্মতি দিয়েছে। হবির খাঁকে কমলা জানিয়েছেন, - "তোমার ছেলে করিম আমার আপত্তি হবে না। আমার না হয় দুই ধর্মই থাকলো।"

এরপর কমলার কাকার দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের সময় ডাকাতরা অপহরণ করলে কমলা তাকে উদ্ধার করে কাকাকে ফিরিয়ে দেয়। কাকা তাকে গ্রহণ করে। হিন্দুধর্মের এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে গল্পটিতে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে।

'উলুখড়ের বিপদ' গল্পে উদ্ধত শাসকগোষ্ঠী আইনের সাহায্য নিয়ে প্রজাপীড়ন করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। সত্যের পূজারী হরিহর প্রথমে হেরেছে, জিতেছে লম্পট নায়েব গিরিশ। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র জমি দখল করে গিরিশ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে জানিয়েছে সবই তার ইচ্ছে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ নারী প্রগতির নামে যে নারীরা পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে প্রগতি সংহার গল্পে তার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন। প্রগতিকে সংহার করা হয়েছে বলেই এরূপ নামকরণ হয়েছে।

'তোতাকাহিনী' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ব্যঙ্গরূপক গল্প। ঔপনিবেশিক যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বাহ্যিক আড়ম্বর ও শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতাকে রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি। প্রচলিত শিক্ষার আনন্দহীনতা ও মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভরতাকে রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে মেনে নেন নি। গল্পটিতে আমরা দেখি এক রাজা মন্ত্রীকে ডেকে তোতা পাখিটিকে শিক্ষা দিতে বলেন। সোনার খাঁচায় বন্দী পাখিটিকে মুখস্থ করানো হচ্ছে অসংখ্য বই এনে বই এর পাতা ছিঁড়ে কলমের ডগা দিয়ে পাখিটির মুখে ঠাসা হচ্ছে। দানা, পানি কিছুই নেই, আনন্দ নেই, গান নেই ও প্রাণ না থাকার ফলে পাখিটি মরে গেল। এই হ'ল ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ স্যাডলার কমিশনের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাবুক মেরেছেন এই গল্পে।

'ভুল স্বর্গ' গল্পে রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদী শ্রমসর্বস্ব দেশের প্রতি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কাজের ফাঁকে অবসর না থাকলে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - "এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই। এখানে পুরুষেরা বলছে, 'হাঁফ ছাড়বার সময় কোথা।' মেয়েরা বলছে, 'বললুম ভাই, কাজ রয়েছে পড়ে।' সবাই বলে 'সময়ের মূল্য আছে।' কেউ বলেনা 'সময় অমূল্য।' ' আর তো পারা যায় না' বলে সবাই আক্ষেপ করে। আর ভারি খুশি হয়। 'খেটে খেটে হয়রান হলুম।' এই নালিশটাই সেখানকার সঙ্গীত।"

এই বিবরণে দাসত্বের কথা আছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রম করিয়ে শোষণের যে চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'গিন্নী' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এটি রবীন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে রচিত। নর্মাল স্কুলে হরনাথ নামে এক শিক্ষক ছিলেন। তার দুর্ব্যহারে ছাত্ররা অতীষ্ট হয়ে যেত। রবীন্দ্রনাথও শিক্ষক হরনাথকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। তার পাঠদানের সময় রবীন্দ্রনাথ কোন কথা বলতেন না। এজন্য রবীন্দ্রনাথকে বহু শাস্তি পেতে হয়েছিল। গিন্নী ছোটগল্পে হরনাথই হলেন শিবনাথ। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হৃদয়হীন আচরণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'স্বর্ণমৃগ' একটি প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে অর্থলোভের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে। বৈদ্যনাথ তার স্ত্রীর স্বর্ণমৃগের তৃষ্ণা মেটাতে সন্ন্যাসীর কাছে ঠকতে হয়েছিল। গুপ্তধনের সন্ধানে কাশীর একটি পুরনো বাড়িতে যেতে হয়েছিল। সব কিছুতে সে ব্যর্থ হল। পরিশেষে বৈদ্যনাথকে গৃহত্যাগ করতে হল স্ত্রীর স্বর্ণতৃষ্ণা মেটানোর জন্য।

'পরীর পরিচয়' রূপকধর্মী গল্প। সামাজিক শ্রেণিভেদ ও শ্রেণিগত ঘৃণা এই গল্পে অন্তঃপুর পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়েছে, এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার জানিয়েছেন। রাজপুত্র বিয়ে করেছিল কাজরী বনের মেয়েকে-কাজরীর বাবা শিকারী, মা তাঁতে কাপড় বুনত। কৃষ্ণবর্ণা কাজরীকে রাজা বিয়ে করে আনবার পর রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যেও কাজরী সুখী হয়নি। অরণ্যের প্রাচুর্য সেখানে নেই বলে সে আবার ফিরে এসেছিল পিতৃগৃহে। সহজ প্রাণের আনন্দই কাজরীর কাছে ছিল একান্ত প্রিয়।

'দিদি' গল্পে স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনস্কতার পরিচয় মেলে। নিজেদের স্বার্থে ঘা লাগলে ছেলে কিংবা স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো হয় না। এমনকি স্ত্রীকেও গুপ্তভাবে হত্যা করা হয়। এই নির্মমতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ - 'দিদি' গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিহিংসা' গল্পটিও প্রতিবাদী শ্রেণিভুক্ত। এই গল্পে জমিদারী দম্ভ ও বংশ গৌরবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। জমিদারের কর্মচারীর স্ত্রীর নাম ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণীর রূপ আভিজাত্যকে হিংসা করেছে জমিদার গিন্নী। পরে ইন্দ্রাণী জমিদারের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে প্রতিহিংসা পূরণ করেছে।

'ব্যবধান' গল্পে শরিকি গণ্ডগোলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এটি একটি পারিবারিক বিরোধের কাহিনী। বনমালী ও হিমাংশু দুই ভাই। বনমালী বড়, হিমাংশু ছোট। মামাতো পিসতুতো এই দুই ভাই এর মধ্যে সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ সখ্যতা একটি বাগানকে কেন্দ্র করে যা গড়ে উঠেছিল সেই বাগানের মালিকানা নিয়ে শরিকি গণ্ডগোল দেখা দেয়। উভয় পক্ষের মামলা চলতে থাকে। সে মামলায় জয়ী হয় বনমালী। বাগানটি তাদের অধীনে চলে আসে। এরপর থেকে হিমাংশুর সাথে বনমালীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। উভয়ের ব্যবধান রচিত হয়।

'দান প্রতিদান' গল্পে ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। নিজের আত্মীয়কে জাল-জুয়াচুরি করে পথে বসানো হয়েছে। এছাড়া নানা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে চড়ানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বার্থপর এই শ্রেণি চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'সমস্যা পূরণ' রবীন্দ্রনাথের একটি সার্থক প্রতিবাদের গল্প। অছিমুদ্দিন এই গল্পের নায়ক, সে এককভাবে নিজের জমির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। আইনের বিচারে অছিমুদ্দিন পরাজিত হলেও সে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। তার সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করবার চেষ্টা চালিয়েছে জমিদার। তাকে পথে বসানোর জন্য জমিদারের উপর তার প্রতিবাদ

হওয়াটাই স্বাভাবিক। একদিন সে একটি ধারালো দা নিয়ে প্রকাশ্য হাটে বিপিন বাবুকে হত্যা করতে যায়। এরমধ্যে সে খুনি আখ্যা পেলেও অছিমুদ্দির মধ্যে শ্রেণি সংগ্রামের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন।

'গল্পসল্প' বই-এর 'বড়খবর' গল্পটিতে শোষক শ্রেণি, শিল্পপতি ও জমিদারদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রমিক বিপ্লব ও শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনের ইঙ্গিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে যে সাম্য চিন্তা আছে তার সার্থক দৃষ্টান্ত এই 'বড় খবর' গল্পটি।

'রাজটিকা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের ইংরেজ তোষণনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এক শ্রেণির রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন।

'সংস্কার' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের অপশাসন এবং সুকৌশলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তীব্র কটাক্ষ করেছেন।

'পণরক্ষা' গল্পে চরকা কাটা, তাঁতে কাপড় বোনা বয়কট, পিকেটিং এর প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু যারা দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখেছেন, কথার সঙ্গে কাজের মিল রাখেননি, রবীন্দ্রনাথ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'বিদূষক' গল্পে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এটি 'লিপিকা' গল্পগ্রন্থের সার্থক ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ বিদূষক চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন এই গল্পে —

"বিদূষক বললে, 'আমি মরতেও পারিনে, কাটতেও পারিনে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।"

— রাজা তার সাম্রাজ্যের লোভে নিস্পাপ হাসিকে খুন করেছিল।

'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে বিধবা জয়কালী নিষ্ঠাচারী, ধর্মপরায়ণ মহিলা। সে ডোমদের বলিদানের শূকরটিকে মন্দিরে স্থান দিয়েছে। ভীত ও তাড়িত শূকর ছানাটিকে স্থান দিয়ে নিরীহ মমত্ববোধের পরিচয় দিয়ে রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে উদারতার বাণীই প্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্পে বংশগৌরবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বোষ্টমী সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

'কর্তার ভূত' গল্পে সমাজের একশ্রেণির রক্ষণশীল মানুষের ভয় ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' গল্পেও রয়েছে প্রতিবাদ। সুভাষিণী প্রকৃতি প্রেমিক। গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে শান্তির বাতাবরণ। কিন্তু তার বাবা সুভাষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে দিয়েছিল

কলকাতার এক অর্থলোভী পাত্রের হাতে। কিন্তু যেদিন তারা জানতে পেরেছিল সুভা বোবা সেদিন তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছিল স্বামী গৃহ থেকে। এরপর বিয়ে হয়েছিল কথা বলতে পারা অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে। স্বামীর এরূপ নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সুভার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ দেখিয়েছেন।

অতঃপর আসছে শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের কথা। বাংলাসাহিত্যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে আরও জোড়ালোভাবে সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর সমাজ ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গল্পগুলির মধ্যে 'পরেশ' গল্পটির নাম উল্লেখ করা যায়। এই গল্পে জ্যাঠামশায়ের প্রতি পরেশের বাবার অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। পরেশ ও জ্যাঠামশায়ের মধ্যে ছিল গভীর সম্পর্ক। সেই জ্যাঠামশাই যখন পরেশের বাবার দ্বারা অপমানিত হয় পরেশ তখন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জ্যাঠামশাই কারও সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে একথা যখন ভাবছিল, তখন পরেশ স্বেচ্ছায় জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে। চলে যাবার আগে জ্যাঠামশাই কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে পরেশ বলেছিল, জিনিসপত্র নেবার কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি ও বাড়ীতে আর তারা ফিরবে না, এরপর গুরুচরণ পরেশের হাত ধরে জনহীন অন্ধকারের পথ বেয়ে রেলস্টেশনের দিকে যাত্রা করল। পুত্র হয়ে পিতার বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ সামাজিক পরিবর্তনের একটা ইঙ্গিত বহন করে।

'মহেশ' গল্পটি শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি। ডঃ শিশিরকুমার দাশ এ গল্পটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন, - "কাহিনীর মধ্যে একটিও অনর্থক চরিত্র বা ঘটনা নেই। .....ঘটনাবিরলতা, কাহিনীর একমুখীনতা ও চরিত্র সৃষ্টির কুশলতা তিনদিকেই মহেশ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। এই একটি মাত্র গল্পে শরৎচন্দ্র বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।" ১৭

এই গল্পে শরৎচন্দ্র সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গল্পের নায়ক গফুর। তার কন্যা আমিনা ও তার পুত্রতুল্য মহেশ নামে একটি গরু রয়েছে। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় তাদের বাস। জমিদার শিবচন্দ্রের অন্যায় আচরণ, ব্রাহ্মণ তর্করত্নের হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ ও হিন্দু প্রতিবেশীদের অত্যাচার গফুর নীরবে সহ্য করেছে। তার ক্ষুধার্ত মহেশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এলে, ক্রোধবশতঃ মহেশকে মেরে ফেলে। অভাবের দিনেও গফুর মহেশকে বিক্রি করতে পারেনি তার প্রতি গভীর মমত্ববোধের কারণে, মহেশের মৃত্যুর পর গফুর যখন তার স্বভূমি থেকে অন্যত্র চলে যায়, তখন বিধাতার কাছে রেখে যায় নালিশ,

".....মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে, তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি! যে তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ

করোনা।"

জমিদারের অত্যাচার, ক্ষমাহীন সমাজ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, নীতিহীন ধর্ম জাতিগত বিদ্বেষের ফলে একজন দরিদ্র কৃষক কীভাবে কারখানার শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে তার বাস্তব চিত্র শরৎচন্দ্র 'মহেশ' গল্পে তুলে ধরেছেন।

'একাদশী বৈরাগী' গল্পে শরৎচন্দ্র ক্ষমাহীন সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই গল্পের প্রধান চরিত্র একাদশী বৈরাগী। অত্যধিক কৃপণতার জন্যে তার এই নামকরণ হয়েছে। তার বৈমাত্রেয় এক বালবিধবা বোন ছিল যার নাম গৌরী। গৌরীর নির্বুদ্ধিতার জন্য ও চঞ্চল মতির জন্য লোভী মানুষের প্রলোভনে চারিত্রিক স্খলন ঘটে। এজন্য সমাজ তাকে ঘৃণার চোখে দেখলেও একাদশী তার বোনকে আশ্রয় দেয়। এই অভিযোগে সমাজপতি স্মৃতিরত্ন একাদশী বৈরাগী ও গৌরীকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে দেয়। এধরনের সমাজপতিরা স্নেহের মূল্য কি, তা দিতে শেখেনি। সুযোগ বুঝে তারা অন্যের টাকা অবৈধভাবে আত্মসাৎ করে। ধর্ম ও নীতি বলে তাদের কিছু নেই। সমাজের ক্ষতিকারক এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ করেছেন।

'আলো ও ছায়া' গল্পের মধ্যেও রয়েছে প্রতিবাদ। সামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে। যজ্ঞ দত্তের সঙ্গে বিধবা সুরমার অবৈধ সম্পর্ক। কিন্তু তৎকালে বিধবাবিবাহ সমর্থিত ছিল না। বিধবা সুরমা যজ্ঞ দত্তের সংসারে আসে। তারপর সুরমা বাপ-মা মরা কায়স্থ কন্যা প্রতুলের সঙ্গে যজ্ঞ দত্তের বিয়ে দেয়। বিয়ের পর যজ্ঞ দত্তের মনে অপরাধবোধ জেগে ওঠে। সে হয়ত সুরমার প্রতি সদয় আচরণ করেনি। এই সূত্র ধরে, নরগণ ও রাক্ষসগণ এর স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে ঠিক মিল হবে না তাই প্রতুলকে যজ্ঞ দত্ত রেখে আসে তার পিসিমার বাড়ীতে। পিসিমার মৃত্যুর পর প্রতুল যজ্ঞ দত্তকে নিয়ে যেতে বলে। প্রতুল যজ্ঞ দত্তের বাড়ীতে এলে তার নীচের ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়। একদিকে প্রতুলের প্রতি অমর্যাদা, অন্যদিকে নিজের অপরাধবোধে পীড়িত হয়ে যজ্ঞ দত্ত নিজে রক্তাক্ত হয়। প্রতুলের মৃত্যুর পর যজ্ঞ দত্ত বাইরে চলে যায় এবং সুরমা একাই থেকে যায় সেখানে।

সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে সুরমা, প্রতুল ও যজ্ঞ দত্তের জীবনের এই করুণ পরিণতি ঘটেছে। শরৎচন্দ্র এভাবেই সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ।

'বোবা' ও 'কাশীনাথ' দুটি গল্পেই কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। উভয় গল্পেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ঘটেছে।

'অনুপমার প্রেম' গল্পের ললিত ও বিধবা অনুপমার প্রেমের সম্পর্ক প্রীতি মধুর হয়নি। এর পেছনে ছিল সামাজিক অনুশাসন।

'মামলার ফল' গল্পে কেষ্ট ও কাদম্বিনী দুই ভাই-বোন, কিন্তু কাদম্বিনী কেষ্টর প্রতি

নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে।

'দর্পচূর্ণ গল্পে' স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের অন্যতম কারণ হল স্ত্রীর অহংকার। যদিও স্ত্রী ইন্দুর অহংকার চূর্ণ হয়েছে ফলে স্বামী নরেন্দ্রের সঙ্গে পুনরায় গড়ে উঠেছে দাম্পত্য সম্পর্ক।

'বিলাসী' গল্পে ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন শরৎচন্দ্র। কায়স্থ মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ের মেয়ে বিলাসীকে বিয়ে করেছিল। এই বিলাসীই মৃত্যুর হাত থেকে একদিন বাঁচিয়ে ছিল মৃত্যুঞ্জয়কে। কিন্তু এই বিবাহকে মৃত্যুঞ্জয়ের কাকা মেনে নিতে পারেনি। প্রেম কোন জাত বিচারকে মেনে চলে না এটাই গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য।

'সতী' গল্পে সহমরণের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে জমিদার শ্রেণির নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অভাগী অন্ত্যজ দুলে সম্প্রদায়ভুক্ত। তার সারা জীবন কেটেছে দুর্ভাগ্য, দুঃখ ও দারিদ্র্য নিয়ে। স্বামী রসিক রায় তাকে ফেলে রেখে অন্যত্র চলে যায়। একমাত্র পুত্র কাঙালীকে নিয়েই তার স্বপ্ন গড়ে উঠেছে। আর জীবনের সবচেয়ে সাধ ছিল স্বামীর পায়ের ধূলো নিয়ে সে মারা যাবে, পুত্র কাঙালী তার মুখে আগুন দেবে। মুখুজ্যে বাড়ীর গিন্নির মতো রথে চড়ে সে স্বর্গে যাবে। মৃত্যুর আগে স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিতে পেরেছিল। তার একটি আশা পূর্ণ হলেও দ্বিতীয় আশাটি অপূর্ণই থেকে যায়। অভাগীর দাহকার্য হয়নি। তার স্বামী তাদেরই পোঁতা বেল গাছ দাহ কার্যের জন্য কাটতে গেলে জমিদারের গোমস্তা বাধা দেয়। কাঙালী জমিদারের কাছে অনুমতি চাইতে গেলে ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ কাঙালীকে বলেছে, —

"তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে। মুখুজ্যে মশায়ের বড় ছেলে চূড়ান্ত ব্যঙ্গ করে বলেছেন। দেখছেন ভট্টাচার্য মশায় সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়।"

শরৎচন্দ্র এভাবে হিন্দু সমাজের জাত-পাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। দুলে জাতের দাহ কার্যে সামান্য কাঠ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। বরং কাঙালীচরণকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। শরৎচন্দ্র উঁচু জাতি ও নীচু জাতিকে দুটো শ্রেণিকে দেখিয়ে উঁচু জাতের মিথ্যা অহংকার ও হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, এবং তাঁর সমর্থন ছিল অত্যাচারিতের প্রতি।

এভাবেই শরৎচন্দ্র সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে পাপাচার ভন্ডামী, দুর্নীতি ও নিষ্ঠুরতাকে দেখেছেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এবার রাজশেখর বসুর গল্প নিয়ে আলোচনা করছি। পরশুরাম ছদ্মনামধারী রাজশেখর

বসু রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হয়ে রবীন্দ্রোত্তর কালে বিশেষভাবে দ্বিতীয় মহাসময় পরবর্তী সময়ে যে মূল্যবোধের অপচয় দেখা দিয়েছিল তা তুলে ধরতে ব্রতী হয়েছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের যথার্থ উত্তরসূরী ছিলেন তিনি। সাতটি গল্পগ্রন্থে শাতাধিক গল্প লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' গ্রন্থে লিখেছেন, — "চারিদিকে তখন মানুষের সর্বাত্মক বিকৃতি ফেটে পড়েছে-সমাজ, ধর্ম, সংস্কার এবং পারিবারিক জীবনের ভিত্তি গড়ে উঠেছে, পুঞ্জীভূত গ্লানিতে জাতি তখন পঙ্কস্নান করছে, মানুষের লোভের ষড়যন্ত্রে পড়া দুর্ভিক্ষে সমস্ত বাংলাদেশ নরকে পরিণত হয়েছে আর কালোবাজারীরা মুন্ডশিকারীর ভূমিকা নিয়েছে। ওদিকে ইংরেজ সরকারের হৃদয়হীন উদাসীনতা, আগস্ট বিপ্লব দমন করবার জন্যে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা, - আর দেশের সম্মান সম্ভ্রমকে ট্যাঙ্ক-জীপ-লরীর তলায় দলিত করে বিদেশী ফৌজের তান্ডব-ভিতরে বাইরে এই অসহ্য যন্ত্রণার চাবুকে জর্জরিত হয়ে উঠে সেদিন বাঙালি লেখকরা কলমের মুখে ক্ষিপ্ত বেদনায় বজ্রদ্যুতি সঞ্চার করেছিলেন - পরশুরামও তখন যুগের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন নি।"১৮

তাঁর গল্পগুলি উদ্দেশ্যমূলক। তাঁর ভাষা এবং চিন্তাধারা নিজস্ব। সমকালীন সমাজের অসংগতি, ভন্ড রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থপরতা, পারিবারিক জীবনের সমস্যা লঘুহাস্যরসের মাধ্যমে তিনি উপস্থাপন করেছেন। মিথ্যাচার, ভন্ডামি, ভাববিলাস ও অহং-কে শ্লেষ কৌতুকের মাধ্যমে পরিবেশন করে সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী আন্দোলনের যোগ্য পথপ্রদর্শক।

'গড্ডালিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'গল্পকথা' 'ধুস্তুরী মায়া', 'কৃষ্ণকলি', 'নীলতারা', 'আনন্দী বাঈ', ও 'চমৎকুমারী' প্রভৃতি গল্প গ্রন্থে সাধু, গুরু, ভবিষ্যত বক্তা থেকে শুরু করে প্রেম বিবাহ, রাজনীতি, সমাজনীতি অর্থনীতি, সাহিত্যাদর্শন, অলৌকিক বিষয়, পুরাণ বিষয় ও কল্প বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে এক নতুন স্বাদের সাহিত্য রস সৃষ্টি করেছেন।

'গড্ডালিকা' গল্পগ্রন্থে "শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" ছোটগল্পে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে বহু লোকের কাছে শেয়ার বিক্রি করে যে লোক ঠকানোর কৌশল আয়ত্ত করেছিল তার বিরুদ্ধে পরশুরাম ব্যঙ্গ করেছেন। অন্যদিকে শ্যামলালের মতো চরিত্রেরা মন্দির প্রতিষ্ঠার নামে যে ধর্মীয় ভন্ডামি শুরু করেছিল, লেখক তার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এছাড়া অসাধু ব্যবসায়ী গন্ডেরিরামের বিরুদ্ধে শাণিত ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন।

'চিকিৎসা সঙ্কট' গল্পে চিকিৎসার নামে যে আড়ম্বর দেখিয়ে রোগীদের রোগ নির্ণয় না করে প্রতারণা করা হয় তার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'মহাবিদ্যা' গল্পে দুর্নীতিপরায়ণ শোষক যারা উচ্চস্তরের চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত তার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

'ভূশন্ডীর মাঠে' গল্পে স্ত্রী সতীত্ব বিষয়ে সমকালীন সাহিত্যে যে নীতির কথা বলেছেন লেখক সেই প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করেছেন।

পরশুরামের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'কজ্জলী'। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য গল্প 'বিরিঞ্চিবাবা'। এই বিরিঞ্চিবাবার ধর্মীয় ভন্ডামি ও সাধুবেশী অসাধুর মুখোশ খুলে দিয়েছেন লেখক। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য, পাশাপাশি অর্থ ও যশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অসৎ উপায় অবলম্বন করা রাজনৈতিক নেতাদেরও প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত করেছেন লেখক।

'স্বয়ম্বরা' গল্পে ইংরেজ অনুকরণের বিরুদ্ধে নগ্নভাবে আক্রমণ করেছেন। নবীন কবিদের প্রতি লেখক আক্রমণ করেছেন 'কচি সংবাদ' গল্পে।

'উলটপুরাণ' গল্পে ভারতবাসীদের ইংরেজ এবং ইংরেজদের ভারতবাসী এই বিপরীতধর্মী চিত্রের মাধ্যমে সুকৌশলে ভারতবাসীকে লেখক নিন্দা করেছেন।

'গল্পস্বল্প' গল্পগ্রন্থের 'গাঁ মানুষ জাতির কথা' গল্পে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে লেখক আক্রমণ করেছেন।

'পরশপাথর' গল্পে পরশুরাম বিশ্ব অর্থনীতিতে স্বর্ণমানের বিপর্যয়ের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে যে ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'রামরাজা' গল্পে পরশুরাম রাজনৈতিক দলাদলি ও হাতাহাতির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছেন। এই গল্পে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী সাম্যবাদে বিশ্বাসী দলের সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বিখ্যাত মিডিয়ার যোগসূত্র তিনি লক্ষ করেছেন।

'শোনাকথা' গল্পে স্বাধীনতা-উত্তর ক্ষমতালোভী নেতাদের সংঘর্ষ ও নীতিহীনতার পরিচয় রয়েছে।

'ধুস্তুরীমায়া' গল্পগ্রন্থে 'রামধনের বৈরাগ্য' গল্পে প্রগতিবাদী লেখকদের সাহিত্যে যৌনতাকে স্থান দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল দিকটি তুলে ধরেছেন, তার বিরুদ্ধে পরশুরাম কটাক্ষ করেছেন। অত্যাধুনিক বিষয় নিয়ে তার এই ব্যঙ্গে সমাজ সচেতনার পরিচয় মেলে।

'ষষ্ঠীর কৃপা' গল্পে অত্যধিক কামুক পুরুষের নারী লোলুপতার বিরুদ্ধে পরশুরাম প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'কৃষ্ণকলি' গল্পগ্রন্থে 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি' গল্পে যে রাজনৈতিক দল রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে মূল্যবোধ ভাঙার দিকে ঝুকেছিল তাদের বিরুদ্ধে রাজশেখর বসু তিরস্কার করেছেন।

'নীলতারা' গল্পে জমিদার শ্রেণির লাম্পট্য দোষ এবং দরিদ্র শ্রেণির প্রতি নির্মম অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

সর্বত্র ভেজাল এবং প্রতারণার ও স্বার্থপরায়ণদের মুখোশ লেখক খুলে দিয়েছেন 'নীলকণ্ঠ' ছোটগল্পে।

'দ্বান্দ্বিক কবিতা' গল্পে আধুনিক সাহিত্যে রোমান্টিক প্রেম ও যৌনতার বিষয়ে লেখকের ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী শাসকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কটাক্ষমূলক গল্প 'মাঙ্গলিক'।

'আনন্দীবাঈ' গল্পগ্রন্থের 'আনন্দীবাঈ' গল্পে আধুনিক স্বার্থপর নারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ দেখানো হয়েছে।

'ডম্বরু পন্ডিত' গল্পে বাস্তবজ্ঞানহীন অহংকারী পন্ডিতদের প্রতি লেখক ব্যঙ্গ করেছেন।

'গুপীসাহেব' গল্পে জাল জুয়াচুরি ও অসৎকাজে যারা লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন।

অতঃপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের প্রতিবাদ আলোচনা করেছি। রাঢ় বঙ্গের রূপকার তারাশঙ্কর গল্পে সামাজিক অবিচার, অর্থনৈতিক, বৈষম্য, সমাজের গ্লানি, বিকৃতি, দাম্পত্য বিরোধ, জমিদার ও প্রজাদের দ্বন্দ্ব, মন্বন্তরসঞ্জাত মহামারী, অন্ত্যজ শ্রেণির অসহায়তা, অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যে অতীত ও বর্তমান, প্রবীন ও নবীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব অভিব্যক্ত হয়েছে। তারাশঙ্করের প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত গল্পগুলির মধ্যে 'ময়দানব', 'কলকাতার দাঙ্গা ও আমি', 'ছলনাময়ী', 'বেদেনী', 'ডাইনীর বাঁশী', 'রাঠোর চন্দ্রেবৎ', 'রায়বাড়ী', 'তিনশূন্য', 'পৌষলক্ষী', 'বোবাকান্না', 'তাদের ঘর', 'সমুদ্রমন্থন', 'স্বাধীনতা', 'নুটুমুক্তারের সওয়াল', ব্যাধ, 'দেবতার ব্যাধি', 'আখড়াই দিঘী, 'জটায়ূ', 'সত্যপ্রিয়ের কাহিনী', 'রাজারাণী ও প্রজা' 'কুলীনের মেয়ে', 'খাজাঞ্চীবাবু', 'পুরোহিত', 'জায়া', 'জলসাঘর', 'রসকলি', 'তারিণী মাঝি', 'সোনার তলোয়ার', 'নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'ময়দানব' গল্পে রয়েছে পুরাতনের সঙ্গে নবীনের দ্বন্দ্ব। একটি ফায়ার ব্রিক তৈরী ও ফায়ার ক্লে'র কারখানার কর্মী ছিলেন ফণি মিস্ত্রী। তার কারখানার সঙ্গে যোগ ছিল গভীর। তার মালিক ও ম্যানেজারের সঙ্গে সম্পর্কে কোন ক্ষোভ নেই। শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে সে কোন উৎসাহ দেখায়নি। মালিকের নিন্দা তার কাছে ছিল অসহ্য। সে মালিকের পক্ষে তর্ক যখন করছিলো তখন এক স্বদেশপ্রেমিকের কাছে সে শুনেছে, -

"মালিক হলেও আমার মালিক সে নয়। সে আমাকে খেতে পরতে দেয়না। আমরা যা খাই, ছাতু, নিমক, আটা-ডাল, ভাত-তরকারী তার একটা দানাও সে আমাকে মেহেরবানী করে দেয়না। সেই আমার খানার ভাগীদার, আমার রোজগারের দানায় সে ভাগ বসায়, আমায় ভুল বুঝিয়ে

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তোমরা ভেবে দেখ, আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কি হাড় ভাঙা খাটুনি খাঁটি! বয়লারে কয়লা ঠেলি, ইঞ্জিন চালু রাখি, মেশিনে মেশিনে কাজ করি। ভাটার আগুন তাতে ঝলসে যাই, পেট ভর্তি ধুলো খাই - সর্বাঙ্গে কাদা মাখি, আমরাই এই কারখানায় খাটি তবে মাল তৈরী হয়। আর সেই মাল বিক্রি করে মুনাফা করে লাখো লাখো টাকা। সে খায় পোলাও, কালিয়া, পরে ফিনফিনে ধুতি, গলায় উড়োয় রেশমী চাদর। দামী জুতো পায়ে দিয়ে মস্‌মস্‌ করে চলে। মোটর গাড়িতে হাওয়া খেয়ে বেড়ায় দোতলায় শোয়, দিনদিন সিন্দুকে জমায় হাজার হাজার টাকা। সে সমস্তই তারা করে আমাদের দানা মেরে, অথচ আমরা কিছু বললেই ওরা আমাদের বলে বেইমান। ইমান আমাদের, ওদের কাছে কি আছে? নিমক আমরা ওদের খাইনা, ভগবানে, খোদাতালার দেওয়া আমার তাগদ্‌ সেই তাগদে আমি মেহন্নত করি, সেই মেহন্নতের রোজগার যারা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঠকিয়ে নেয় — তাদের কাছে আমাদের কিসের ইমান? বেইমান তারা।"

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'ময়দানব' গল্পের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন - "নতুন বৈদ্যুতিক শক্তির আবির্ভাবেই পুরানো কারখানার সর্বেসর্বা ফণী মিস্ত্রীকে সইতে হয় চূড়ান্ত অপমান, আর সেই অপমানের বেদনা ভুলতে ফণীকে কারখানার প্রাইডিং মেশিনের চাকার দাঁতে আত্মবলি দিতে হয়।" ১৯

"কারখানা তাকে ছেড়ে দেয়নি। সে তাকে গ্রাস করে নিয়েছে - তার দাঁতের দু'পাশে বেয়ে পড়েছে রক্তের ধারা। দাঁতের পাশে লেগে রয়েছে মাংসের টুকরো - পাশে মেঝের উপর পড়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়ের টুকরো।"

অকস্মাৎ অতি চঞ্চলভাবে খর্বাকৃতি মানুষটি বলিয়া উঠিল আঃ ছি, ছি, ছি! দুই হাত দিয়া সম্মুখের পটভূমি হইতে কি যেন সে মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিতে ছিল। অবশেষে আপনার হাতখানা সজোরে ক্ষিপ্ত পশুর মত সে কামড়াইয়া ধরিল। দেখিতে দেখিতে দাঁতের পাশ দিয়া বীভৎসভাবে রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িল। সভয়ে অমিয় ডাকিল - ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু। ক্ষত বিক্ষত হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া রক্তাক্ত মুখে একান্ত শ্রান্ত ক্লান্তভাবে তিনি বলিলেন, -অতি যন্ত্রণায় সম্বিত ফিরে আসে — তাই। মানুষ তো আমি অমিয় বাবু।"

তারাশঙ্করের 'পিতা ও পুত্র' গল্পে প্রবীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। এই গল্পের নায়ক শশিশেখর। সে ইংরেজিতে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তার সঙ্গে প্রাচীনপন্থী টোল ও সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগী ন্যায়তীর্থের বিরোধ। গল্পের পরিণতি অত্যন্ত করুণ। শেষপর্যন্ত শশিশেখর আত্মহত্যার পথকে বেছে নিয়েছিল।

'সন্তান' গল্পটিতে রয়েছে প্রতিবাদ। গোবিন্দ এ গল্পের নায়ক। দেখতে সে কুৎসিত, এজন্য আত্মগ্লানিতে সে আচ্ছন্ন। সে কামনা করেছিল তার মতো কুৎসিত একটি ছেলে না হয়ে সুন্দর

একটি ছেলের জন্ম হোক। গোবিন্দ কঠোর পরিশ্রমী ও অমায়িক ব্যবহার তার। অথচ তাকে বিয়ে করেত হলে চাকুরী পেতে হবে। সে চাকুরী পেয়েছিল জমিদার বাটিতে। জমিদারের বোনের একটি সুন্দর শিশুপুত্র ছিল। একদিন বিকৃত, কুটিলভাবে সে ছেলেটিকে আদর করে, সেই অভিযোগে তার চাকুরীও চলে যায়। এরপর সে চলে আসে তার বাড়িতে এবং বিয়ে করে বোষ্টমী মঞ্জরীকে। বিয়ের পর মঞ্জরী সন্তানসম্ভবা হলে গোবিন্দ তাঁকে পিত্রালয়ে রেখে আসে। পিত্রালয়ে মঞ্জরী একটি সন্তান জন্ম দেয়। এই সংবাদ শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে সে শ্বশুর গৃহে চলে যায় ছেলেটিকে দেখবার জন্য। কিন্তু ছেলেটি অনিন্দ্যসুন্দর হয়নি। তারই মতো কুৎসিত দেখে রেগে গিয়ে ছেলেটিকে হত্যা করে। এরপর সে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পুত্র খুনের ঘটনায় তার আশ্রয় হয় উন্মাদাগারে। সেখানে তাকে চিকিৎসাধীনে রাখতে হয়। তার থাকবার কক্ষে চারদেওয়ালে এক সুন্দর শিশুর ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়। তারাশঙ্কর লিখেছেন, "গোবিন্দ তাহাদের সহিত কথা কয়, হাসে, নাচে। ছবিগুলির মানিক।"

'বোবা কান্না' গল্পে রয়েছে সংস্কার ও বিজ্ঞানের বিরোধ, অতীত ও বর্তমানের সংঘর্ষ। দেবী চণ্ডীর পূজারী দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের ও বর্তমান যুগের প্রতিনিধি তরুণ ডাক্তার মিহির মুখুজ্যের বিরোধ এ গল্পের বিষয়। মহামারীতে মৃত্যু হয়েছে অনুঠাকুরের। ঘরে তার বিধবা স্ত্রী। বিখ্যাত চোর শশী ডোম তার প্রতি আসক্ত হয়। অসহায় বোবা বধূটি তার স্বামীর জন্য শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। শশী মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। একদিকে মন্বন্তর, অন্যদিকে মৃত্যু তার পাশে অসংযত শশী ডোমের ভোগাকাঙ্ক্ষা সর্বত্রই নৈরাশ্যের দ্যোতক। এই অধঃপতিত সমাজের বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তারাশঙ্কর অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন 'ডাইনী' ও 'ডাইনীর বাঁশী' ছোটগল্পে। ডাইনী তাদেরই বলা হয়, যাদের অশুভ দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে, মানুষ অসুস্থ হয়, মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এ ডাইনীরা আসলে সাধারণ মানুষ। তাদের ওপর প্রেতাত্মারা ভর করেনা, তবুও ধর্মবিকারজনিত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ডাইনী চিহ্নিত নারীদের জীবন্ত দগ্ধ হতে হয়। তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়।

'ডাইনী' গল্পে সুরধনী জেনে এসেছে যে তার বিষদৃষ্টি মানুষের মৃত্যুর কারণ। তিন-চারটি গ্রাম ধ্বংস করে সুরধনী রামনগরে এসে বাস করছে। আকাশ পথে গাছ চালিয়ে ছাতিফাটা মাঠের নির্জনরূপে মুগ্ধ হয়ে সে ঘর বেঁধেছে। কামরূপের বিদ্যা তার জানা ছিল। সারাটা জীবন সে অপবাদের গ্লানি বহন করে চলেছে। ভগবানের কাছে তার এই লজ্জা নামিয়ে দেবার জন্য বারবার আবেদন জানিয়েছেন। তার চোখের জল মুছতো কাপড়ের আঁচলে, যদি কখনো মাটিতে পড়ত তাহলে সে ভয়ে শিউরে উঠত। মা বসুমতী হয়ত জ্বলে উঠবে। তার বঞ্চিত জীবনে চেতনার অভাব ছিল না।

একদিন এক বাউড়ী ছেলে আর এক স্বামী পরিতাক্তা উচ্ছলা মেয়ের প্রণয়গুঞ্জন শুনে ডাইনীটির অতীত জীবনের কথা স্মরণে এসেছিল। তাদের প্রণয়ের সাফল্য কামনা করে যখন সে তার গচ্ছিত বালা জোড়া উপহারস্বরূপ দিতে চেয়েছে তখন তারা ভয়ে সেখান থেকে পালিয়েছে। স্বামীর জন্য কখনো সে কেঁদে উঠত। তার স্বামী ফিরে আসুক এটাই ছিল তার একান্ত কামনা। কিন্তু তার জীবনের এক করুণ রূপ আমাদের ভাবিয়ে তোলে। অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে একটি নারীকে ডাইনীরূপে চিহ্নিত করার বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'ডাইনীর বাঁশী' গল্পে স্বর্ণ ডাইনী বিশ্বাস করত সে ডাইনী। শুকনো কাঠের মতো তার চেহারা, নরুন চেরা চোখ, চোখের তারা তার খয়েরী রঙের। কাউকে স্নেহ করলে সে শিউরে উঠত, কাউকে চোখে দেখলে সে চোখ বন্ধ করত। তার নিঃসঙ্গ এবং মর্মান্তিক বেদনা নিয়ে সে জীবন অতিবাহিত করত। একদিন স্বর্ণর উপহার দেওয়া বাঁশিটি বাজাতে বাজাতে টুকু রাস্তা দিয়ে চলছে, স্বর্ণ তখন বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়েছিল। মানবিক গুণ থাকা সত্ত্বেও এধরনের অন্ধবিশ্বাস স্বর্ণের জীবনকে কতটা মর্মস্পর্শী করে তুলেছে তার জন্য তারাশঙ্কর সহানুভূতি জানিয়েছেন এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।

তারাশঙ্কর অন্তজ্য শ্রেণির প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সচেষ্ট। বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে সমাজে যারা অবহেলিত উচ্চকোটির কাছে যারা ছোটলোক হিসেবে চিহ্নিত তারাশঙ্কর অত্যন্ত মনযোগী দৃষ্টি নিয়ে তাদের ক্লেদাক্ত জীবনের ছবি এঁকেছেন। পঙ্কের মধ্যে থেকেও তিনি পঙ্কজের ছবি আঁকতেও ভোলেননি।

'স্থলপদ্ম' তারাশঙ্করের এমনিই একটি গল্প। বেলে ও হারা এই ছোটগল্পে বঞ্চিত শ্রেণির প্রতিনিধি। তাদের বঞ্চিত জীবনকথা সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখেছেন - "গ্রামের প্রান্তে পায়রার খুপরির মতো ছোট ছোট ঘর, চারিদিকে আবর্জনা, কালিপড়া হাঁড়ির গাদ, ছাইএর রাশ, দুর্গন্ধে বাতাস বিষের মত ভারী, অধিবাসীগুলো ওই আবর্জনার মতই নোংরা, কালিমাখা হাঁড়িগুলোর মতই গায়ের রং, দেহের কাঠামো খাপছাড়া রকমের দীর্ঘ, পায়ে মাংস নাই, মেয়েগুলোও তাই, তার উপর শ্রীহীন সাজে আরও কুৎসিত দেখায়, মাথায় খাটো চুলে যোগান দিয়া বিড়ের মত প্রকাণ্ড খোঁপা, তাহাতে অগুনিত বনকুঁড়ির সারি, পরণে বাহারে পাড়-শাড়ি, কিন্তু ময়লা চিট, আর পরিবার সে কি ভঙ্গি! ছোটলোকদের দল সব, সমাজে আবর্জনার সামিল, গ্রামের এক প্রান্তে আবর্জনার মতোই পড়িয়া আছে।"

রুশ বিপ্লব ও স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান সাহিত্যের প্রভাবে কল্লোল যুগের নতুন কিছু আবিষ্কারের প্রবণতা 'স্থলপদ্ম' গল্পে লক্ষণীয়। সমাজের এই শ্রেণিবৈষম্যের দিকে তারাশঙ্কর আলোকপাত করেছেন, এবং শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'প্রত্যাবর্তন' গল্পেও রয়েছে প্রতিবাদ। ট্যারা এই ছোটগল্পের নায়ক। দুঃখ তার জীবনসঙ্গী। অভাবের তাড়নায় ট্যারা সংসারচ্যুত হয়ে দেশান্তরী হয়েছিল। ফিরে এসে মোহন্তের সেবা ও শুশ্রূষা করতে করতে মোহন্তের তরুণী কন্যাকে নিয়ে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখে ট্যারা। ব্যর্থ মনোরথে সে আবার দেশান্তরী হয়।

'নারী ও নাগিনী' গল্পের নায়ক খোঁড়া শেখ। ঘরে তার স্ত্রী জোবেদা। খোঁড়া সাপ নিয়ে খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একদিন একটি সাপ সে ধরে আনে। উদয়নাগকে সে শিরে সিঁদুর লাগিয়ে আদর করে আর চুম্বন দেয়। জোবেদাকে সতীন বলে পরিচয় করায়। জোবেদা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। আসঙ্গলিপ্সা যখন সাপটির মনে জাগে তখন খোঁড়া সাপটিকে ছেড়ে দিয়ে আসে এক মাঠে। খোঁড়ার প্রতি টানে সে ফিরে এলে জোবেদা তাকে একটি ঘুঁটে দিয়ে আঘাত করে। তারপর রাতের অন্ধকারে উদয়নাগ জোবেদাকে দংশন করে - প্রতিশোধ নেয় - জোবেদা বিবির অপমানের। খোঁড়া সাপটিকে বধ করতে পারেনি। সে বলেছিল —

"শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।"

'বেদেনী' গল্পের নায়িকা রাধিকা। শম্ভু বাজিকরের স্ত্রী সে। সাপের খেলা, বাঁদর ও ছাগল নিয়ে খেলা দেখায় রাধিকা। কেষ্টোও আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে খেলা দেখায় ঘুরে ঘুরে। তরুণ কেষ্টকে দেখে রাধিকা মুগ্ধ হয়-কেষ্ট তার বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। শম্ভু প্রতিদ্বন্দ্বী কেষ্টকে প্রতিহিংসাবশত পুলিশে ধরিয়ে দিতে চাইলে রাধিকা শম্ভুর পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। শম্ভু তা জানতে পেরে রাধিকাকে মারধোর করে। এর ফলে রাধিকা শম্ভুকে পরিত্যাগ করে শম্ভুর তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কেষ্টকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই গল্পেও প্রতিবাদ রয়েছে।

'দেবতার ব্যধি' গল্পে ডাক্তার গড়গড়ির বক্তব্যে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। সে প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ করেছিল, "ছেলেদের দেবতা হবার উপদেশ দেবেন না। মানুষ শুধু হতে উপদেশ দেবেন। দেবতাকে পুজো করতেও উপদেশ দেবেন না। তার সঙ্গে লড়াই করার মত সাহস দেবেন তাদের।"

গ্রামের সাধারণ মানুষ ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশত দেবমন্দির বানিয়েছিল - নৈবেদ্য বলি দেওয়া হল মন্দিরে। কিন্তু ডাক্তার গড়গড়ির ছিল নারীমাংস লোলুপতা। সে একটি তরুণী মেয়েকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু তাকে ভালোবাসেনি। রূঢ়তা ও নির্মমতার মুখোশধারী গড়গড়ি চরিত্রের বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'কাত্যয়নী' গল্পে কাত্যায়নী শিশু খুনের আসামী। তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কাত্যায়নী তার জায়ের ছেলেকে মায়ের মতো আদর করত। স্নেহবশত সে পরজন্মে নিজের সন্তানরূপে শিশুপুত্রটিকে পাবার জন্য হত্যা করে। এরূপ নৃশংস চরিত্রের বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর প্রতিবাদ

জানিয়েছেন।

'শ্মশান বৈরাগ্য' ছোটগল্পের একই থীম রয়েছে।

'তারিণী মাঝি' গল্পে ময়ূরাক্ষীর বন্যায় জলের ঘূর্নিচক্রে পতিত হয় তারিণী ও তার স্ত্রী। অবচেতন মনে বাঁচার জন্য তারিণী সুখীর গলা টিপে ধরে জলের মধ্যে। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে সে প্রেমকে অস্বীকার করে। সুখীকে হত্যা মূলত নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা। এর মধ্যে জীবনধর্মের পরিচয় মেলে।

লোভের অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে তারাশঙ্করের প্রতিবাদী ছোটগল্প 'অগ্রদানী'। শ্যামাদাস বাবুর স্ত্রীর সন্তান জন্ম হয়ে মারা যেত। একই সময়ে পূর্ণ চক্রবর্তীর স্ত্রীও শ্যামাদাস বাবুর স্ত্রী সন্তান প্রসব করে। অভাবের কারণে ও লোভবশত সকলের অজান্তে চক্রবর্তী নিজ পুত্র বদল করে। চক্রবর্তীর পুত্র শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে বড় হতে থাকে। তার নিজের স্ত্রী একটি ছেলে রেখে মারা যায়। শ্রাদ্ধের দিনে শ্যামাদাসবাবুর অনুরোধে চক্রবর্তী নিজ নাতির হাত থেকে পুত্রের পিণ্ড গ্রহণ করেছে। এক নিষ্ঠুর বিচারকের ভূমিকায় তারাশঙ্কর চক্রবর্তীর উপর দণ্ড বিধান করেছেন —

"শ্রাদ্ধের দিন। গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল। পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্তী।" লোভের খর্গে এভাবেই চক্রবর্তী বলি হয়েছে। উদর সর্বস্ব নির্লজ্জ হীনচিত্ত পূর্ণ চক্রবর্তী কুৎসিত চরিত্রটির স্বরূপ এভাবেই লেখক তুলে ধরেছেন।

'সমুদ্র মন্থন' গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তরে সমুদ্র মন্থনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই সমুদ্র মন্থনের ফলে উঠে এসেছে কুৎসিত সর্বরিক্ত গ্লানির হলাহল। মন্বন্তর পীড়িতা মৃত্যুপথযাত্রিণী এক নিম্নশ্রেণির কঙ্কালসার তরুণীর দাম্পত্য প্রেম ইমানত ও রমার শেখার বিষয়। এই দম্পতির নিত্যকলহের বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গল্পের পরিণতিতে যদিও উভয়ের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলে গল্পকার শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

'কলকাতার দাঙ্গা ও আমি' গল্পে লেখকের প্রতিবাদী মনের পরিচয় রয়েছে। ছেচল্লিশে কলকাতার বুকে যে নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের আত্ম উন্মোচনের বিষয় অবলম্বনে এই গল্পের অবতারণা — "কলকাতার এত বড় হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কাপুরুষের মত ঘরে বসে শুধু অনুশোচনা করেছে, উন্মত্তকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্য কিছু করতে পারি নাই - প্রতিষ্ঠা হানির ভয়ে, নিজের প্রাণের মমতায়। আরও অনেক-অনেক পাপ। সেসব কথা কি এদের সামনে প্রকাশ করতে পারি? পারি না।"

'নব মহাপ্রস্থান উপাখ্যান' গল্পটিতে তারাশঙ্কর মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের নায়ক, নাথুরাম গডসের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন। লেখকের একমাত্র আদর্শ ছিল জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। তাঁরই আকস্মিক হত্যাতে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

'বিলিতি মাস্টার' গল্পে অতি সাধারণ ক্ষুদ্রতার জন্য বিলিতি মাস্টারের জীবনে মেধা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও জীবনের অসফল দিকটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই নির্দোষ ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে।

'শশীশেখর' গল্পে রয়েছে ব্যক্তির প্রতিবাদ। এক জমিদারের পুত্রের অহংকার, দম্ভ এবং নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

'মালাচন্দন' গল্পের নায়ক কিশোর গোঁসাই। সে মিথ্যের বেসাতি করত। বহুজনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করত। যেদিন তার প্রকৃত স্বরূপ স্থানীয় সকল শ্রেণির মানুষ উপলব্ধি করল তখন কিশের গোঁসাই এর মিথ্যের বেসাতি আর খাটলোনা। এই মিথ্যের বেসাতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'রঙিন চশমা' গল্পের নায়ক কিশোর গোঁসাই। সে মিথ্যের বেসাতি করত। বহুজনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করত। যেদিন তার প্রকৃত স্বরূপ স্থানীয় সকল শ্রেণির মানুষ উপলব্ধি করল তখন কিশোর গোঁসাইয়ের মিথ্যের বেসাতি আর থাকল না। এই মিথ্যের বেসাতির বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'বাউল' গল্পে বাউলের আদর্শভ্রষ্ট এক বাউলের জীবনলিপি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন লেখক। যে বাউল জীবনের প্রথমদিকে কৃষ্ণচরণে নিবেদিত প্রাণ ছিল সর্পাঘাতে মৃত্যু পথযাত্রিনী একটি বালিকাকে বাঁচিয়ে তুলে তার মায়া বন্ধনে সে আবদ্ধ হল। কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত সেই বাউলটি এক মোড়লের অর্থানুকুল্যে একটি কুটির নির্মাণ করে সুখে দিন কাটাতে লাগলো। বালিকার প্রেমে আবদ্ধ হয়ে সে ভুলে গেল কৃষ্ণ পাদপদ্মের কথা। তার এই নৈতিক অধঃপতন মৃত্যুর কারণ রূপে দেখা দিল। মৃত্যু পথযাত্রিনীকে সে বাঁচাতে পারলেও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি।

'বিষধর' গল্পের নায়ক বিনয়কৃষ্ণ রায়। সে যখন আশি বছরে পদার্পণ করে তখন এক সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী যুবতী শিষ্যার সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ হল। এনিয়ে গ্রামে শুরু হয়ে যায় শোরগোল। সমাজের হিতসাধনের জন্য যে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট ছিল, যার সম্পর্কে সমাজের সাধারণ লোকের মধ্যে উন্নত ধারণা ছিল বৃদ্ধ বয়সে বিনয়কৃষ্ণ রায়ের অবৈধ সন্তানের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে লেখক তার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এভাবে তারাশঙ্কর ভণ্ডগুরুর নৈতিক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছেন।

তারাশঙ্করের 'না' একটি বিখ্যাত প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে কালীনাথ ও তার স্ত্রী ব্রজরাণী এবং পুত্র অনন্ত প্রধান তিনটি চরিত্র। অনন্তের বিবাহ ব্যাপারে কালীনাথের প্রবঞ্চনা এবং নতুন বউ এর প্রতি নির্দয় ব্যবহার অনন্তের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু করে, ফলস্বরূপ অনন্তের হাতে তার পিতার মৃত্যু ঘটে, অনন্তের মা ব্রজরাণী অনন্তের অপরাধ আদালতে প্রকাশ করবে এরূপ দৃঢ় অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও পুত্রের ভবিষ্যতের কথা মনে করে আদালতে হাজির হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর অনন্তর মা মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে চিৎকার করত। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার পর থেকে সে শান্তিতে ঘুমোতে পেরেছিল। সন্তান বাৎসল্যের কারণে ব্রজরাণীর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবার বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'মরামাটি' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় লেখা একটি অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। যুদ্ধের বাজারে দেশের অর্থনীতি যখন ভেঙে পড়ছে, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সারা দেশ যখন আচ্ছন্ন, জাপানী বোমার আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য শহরের লোক গ্রামের দিকে যাত্রা করছে, এসময় লেখকের গৃহে এক মুখরা অপ্রিয়বাদিনী তুলসীর আগমন ঘটে। তুলসীর উপর বহু পুরুষের ভোগলিপ্সা তাকে প্রতিবাদী করে তুলেছিল। সে কাজ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তারাশঙ্কর একটি অসহায়া নারীর পক্ষ অবলম্বন করে তৎকালীন নারী সম্ভোগবিলাসী ব্যক্তিদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

'জায়া' গল্পের নায়ক শিবনাথ. তার স্ত্রী উমা। কোন একটি সাংঘাতিক অপরাধের অভিযোগে শিবনাথের কারাবাস হয়েছিল। কারাবাসের ফলে তার শরীর ভেঙে পড়ে। শিবনাথের চেহারায় কুশ্রীতার ভাব রয়েছে কারামুক্তির পর। স্ত্রী উমার অভিমান ও অনুযোগ তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। তাকে দেখে অনেকে নায়েব ভেবে উৎকোচ দিতে চেয়েছে, কেউবা চাকর ভেবে তার কাছ থেকে পদসেবা করিয়ে নিতে চায়। কেউবা তার মাথায় চপেটাঘাত করে অপমানিত করে। সর্বোপরি স্ত্রীর অপমান তো আছেই, সংশোধনাগারে থেকে শিবনাথের চারিত্রিক সংশোধন ঘটলেও সমাজের চোখে সে নিন্দনীয়। তারাশঙ্কর নিন্দনীয় শিবনাথ চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন। বহুজনখ্যাত গান্ধীজীর সেই অমর বাণী পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়, এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারাশঙ্কর জায়া গল্পটি লিখেছেন।

'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' গল্পে তারাশঙ্কর চীন-ভারত সংঘর্ষের পটভূমিকায় কমিউনিষ্ট পার্টির চীন ভজনা, এবং আগ্রাসী চীনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'সত্যপ্রিয়ের কাহিনী' গল্পে সত্যপ্রিয় জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'তিনশূন্য' গল্পটি রচিত হয়েছে এক ভিখিরির জীবনকে কেন্দ্র করে। কামনালুব্ধ ভিখিরি লালসা মেটানোর জন্য ব্যস্ত। আদর্শভ্রষ্ট এই ভিখিরির বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে রয়েছে মুকুন্দ পালের সঙ্গে যুবক চাষি কৃষ্ণ পালের বিরোধের কাহিনী। মুকুন্দপাল যুবক সাজতে মদ্যপান করেছে.তারপর তার মৃত্যু, গল্পে ট্র্যাজিক পরিণতি বহন করেছে।

'রায়বাড়ি' গল্পে রাবণেশ্বর রায়ের গোমস্তাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে মুসলমান, বাগদি ও হাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষদের জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পাপে রাবণেশ্বরের চরিত্রের

পরিবর্তন ঘটেছে। সে বাণে ভাসা প্রজাদের জন্য মহল খুলে দিয়ে মহৎ গুণের পরিচয় দিয়েছে। একদিকে নিষ্ঠুরতা অন্যদিকে ঔদার্যে সার্থক এই চরিত্র।

অতঃপর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রতিবাদ আলোচনা করছি। — প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে রোমান্টিক জগৎ তথা প্রকৃতি প্রেম, অতীত প্রীতি ও অতীন্দ্রিয় জগৎ তথা অলৌকিক রহস্য মুখ্য স্থান অধিকার করে থাকলেও তার বহু গল্পে বাস্তবতা বোধের অভাব ঘটেনি। তিনি যে আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন বহু গল্পে তার প্রমাণ মেলে।

বিভূতিভূষণ যে শ্রেণি সচেতন শিল্পী ছিলেন 'সই' , 'পার্থক্য' , 'কয়লা ভাঁটা' , 'পারমিট' , 'হিঙের কচুরি' , 'পুঁইমাচা' ,'দুর্মতি' , 'অভয়ের অনিদ্রা' , 'মেঘমল্লার' , 'বিপদ' ,'বড় দিদিমা' , 'কিন্নরদল' , 'জন্মমৃত্যু' , 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'মৌরীফুল' ,'তিরোলের বালা' , 'কুয়াশার রঙ' , 'ভন্ডুল মামার বাড়ি' , - এইসব ছোটগল্পে তার পরিচয় মেলে।

গ্রাম বাংলার তুচ্ছ অবহেলিত জীবনের ব্যর্থতা-বেদনা ও বঞ্চনার ছবি বিভূতিভূষণের বহু ছোটগল্পে থাকলেও 'পুঁইমাচা' ছোটগল্পটি একটি ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। সহায়হরি, অন্নপূর্ণা, ক্ষেন্তি ও কালীময় ঠাকুর চরিত্রগুলি বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা। ক্ষেন্তির পুঁই-এর ডাঁটা দিয়ে চিংড়ি মাছের চচ্চরি খাবার লোভের ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিরোধ বিভূতিভূষণ অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। ক্ষেন্তির যখন পূর্ণ যৌবন সহায়হরি ও অন্নপূর্ণা মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ নেয়। তার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হয়ে যাওয়ার পরেও চন্ডীমন্ডপে গ্রামের মোড়লের উপস্থিতিতে বিয়ে ভেঙে যায়। পণের টাকা যোগাতে হয়েছিল সহায়হরিকে। কিন্তু আড়াইশো টাকা অসহায় সহায়হরি দিতে পারেনি বলে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ক্ষেন্তিকে পিতৃগৃহে পাঠাতে চায়নি। ক্ষেন্তির নামে মিথ্যে নিন্দা ছড়ায়। এছাড়া তার বিয়ের আগে ক্ষেন্তির সঙ্গে যে পাত্রের বিবাহ প্রস্তাব এসেছিল সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছিলেন, পাত্রটির চারিত্রিক দোষের অভিযোগে। এক কুম্ভকার বধূর সঙ্গে পাত্রটির অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এই সংবাদ জানবার পর বধূটির আত্মীয়স্বজন পাত্রটিকে প্রহার করে। এই চরিত্রহীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে না দিলে সহায়হরিকে একঘরে করে রাখবে একথা শোনায় কালীময় ঠাকুর। বিয়ের আশীবাদ হলে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কারে বিবাহ বন্ধন দৃঢ় হয়। গ্রাম প্রধান ও কালীময় ঠাকুরের এরূপ সংস্কারের বিরুদ্ধে ভয় দেখানো নিঃসন্দেহে প্রতিবাদের পরিচায়ক।

ক্ষেন্তির বিবাহের পর তাকে যেমন পিতৃগৃহে পাঠায়নি এমনকি ক্ষেন্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেও সে সংবাদ জানানো হয়নি পিতা-মাতাকে। এরপর ক্ষেন্তির গায়ের স্বর্ণালঙ্কার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা খুলে রেখে তাদেরই এক আত্মীয়ার গৃহে ক্ষেন্তিকে রেখে যায়। শোকে দুঃখে সেখানে

ক্ষেন্তির মৃত্যু ঘটে। বিভূতিভূষণ পুঁইমাচা গল্পে পণপ্রথার বিরুদ্ধে ও তৎকালীন সমাজ বিধান দাতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'অভয়ের অনিদ্রা' গল্পে নববধূ বকুল কৃপণ অভয়ের ঘরে এসেছে। অভয়ের হাতটান ছিল প্রবল। অভয় বকুলকে শুনিয়েছিল যে বকুলের মৃত্যু হলে সে তার মৃত্যুর স্মৃতি হিসেবে তাজমহল বানিয়ে দেবে। এই ব্যাপারে বকুল বিরূপতার কথা জানায় এবং তাকে আশ্বস্ত করে অভয় বলে-সবই তোমার। অভয়ের স্ত্রী সাবান নিয়ে আসবার অনুরোধ জানালে অভয় গম্ভীরভাবে বলে — "ফেনা করে সাড়ে চার আনা পয়সা জলে দেবে?"

বকুল এরপর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তারের জন্য দশটাকা খরচ হয়, কিন্তু বকুল আর বাঁচেনি। তার মৃত্যুর পর রান্নার লোকের জন্য মাসে দশ টাকা করে বছরে একশত কুড়ি টাকা গুণতে হবে শুনে অভয় শিউরে ওঠে। একদিন অভয় মৃত পত্নীর গয়নার বাক্সগুলো খুলে দেখে এক আনা সোনার কানের দুল দুটি নেই। এতে অভয়ের প্রতিক্রিয়া - "সে তাহার স্ত্রীর গহনার বাক্সটি আবার ফর্দ মিলাইয়া দেখিল। না সে জিনিসটি নাই। অভয়ের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মানুষ মানুষকে কি এমন করিয়াই ফাঁকি দেয় ? .....গহনার বাক্সটির পানে সে শ্যেন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল .....যতবার সে ঘুমাইতে যায়, ততবারই ঐ ফুল দুটির হিংস্র উজ্জ্বলতা যেন ধক্‌ধক্‌ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে মাথায়। সারারাত্রি সে জাগিয়া রহিল, সারারাত্রি সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। স্ত্রীর মৃত্যুতে কেন সে ভাগ্যবান হইল না।"

'সই' বিভূতিভূষণের দৃষ্টি আকর্ষণকারী গল্প। সই পাতিয়েছিল একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের সঙ্গে দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল সচ্ছল পরিবারে এবং দরিদ্র পরিবারের মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল এক গরিব পাত্রের সঙ্গে। গরিব মেয়েটি একদিন তার রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়ে সই এর সঙ্গে দেখা করতে আসে। সে আশা করেছিল সই হয়তো ছেলেটিকে মন্ডা মিঠাই খাওয়াবে। কিন্তু তা হয়নি একটু গুড় ও জল খেতে দিয়েছিল তাকে। সই-এর স্কুল ফেরৎ ছেলেটিকে ভালভাবে খাইয়ে বিছানায় বিশ্রাম করতে গিয়েছিল। সই-এর প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখায়নি সে। উপেক্ষিত সইকে বসতেও সে বলেনি। বারান্দায় সিঁড়িতে সে বসে ছিল। কর্তা গৃহে ফিরে আসবার সময় তাকে সিঁড়ি থেকে সরে বসতে বলেছিল। দরিদ্র মানুষের প্রতি সচ্ছল শ্রেণির এরূপ হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই ছোটগল্পে। সমাজের এক শ্রেণির মানুষ অর্থ কৌলীন্যকেই বড় করে দেখে - এই ছোটগল্পে সখিত্বের সম্পর্কও গৌণ হয়, - একের প্রতি অপরের উদাসীনতায়।

বিভূতিভূষণের শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মূলক গল্প 'পার্থক্য।' এক ভিখিরির

সঙ্গে উচ্চ শ্রেণির পার্থক্য দেখানো হয়েছে 'পার্থক্য' ছোটগল্পে। মন্বন্তরের সময়ে এক ভিখিরি এসেছিল এক গৃহস্থের দ্বারে ভাত, ফ্যান, কিংবা চালের প্রত্যাশায়। সম্পন্ন গৃহস্থ ভিখিরিদের ভিক্ষা দিয়ে বিদায় করলেও ক্ষুধার্ত ভিখিরিকে ভাত খেতে দেয় নি। তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ঐদিনই এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত একটি ছেলে জল খেতে এসেছিল। গৃহস্থটি তাকে খেতে দিয়েছিলেন। সে ছিল লেখকের জাতিভুক্ত। জাতিগত বা বংশকৌলীন্যের মধ্যে যে শ্রেণিবৈষম্য লক্ষ্য করা যায় লেখক এই গল্পে সেটাই দেখিয়েছেন।

শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিভূতিভূষণের এক প্রতিবাদী গল্প 'কয়লাভাটা'। কুলি-কামিনদের ঝুড়ি পিছু কয়লার দাম ছিল ছয় টাকা। এটি ন্যায্য দাম নয় ভেবে তার দাম দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল ঠিকাদার দেবেন মাইতির দল। দেখা গেল বেশি দাম পেয়ে নেশাতে আসক্ত হল কুলিরা। তখন আবার দাম কমিয়ে ছয় পয়সায় আনা হল। আসলে এরূপ কারসাজি করার কারণ হল মুনাফার জন্য। দাম বাড়লে মুনাফা কমবে, দাম কমালে মুনাফা বাড়বে এই ভেবে দাম কমিয়ে দিয়েছিল তারা। সর্বহারা শ্রেণিরা যদিও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নি। তবে শ্রেণি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ নিয়ে লেখক এই গল্পটি লিখেছেন।

বিভূতিভূষণের 'হিঙের কচুরি' কিংবা 'বিপদ' গল্পে দালালদের কুচক্রে পড়ে দেহজীবিনী রমণীদের জীবনকথা ব্যক্ত করেছেন। লেখক তাদের স্বাভাবিক নারী চরিত্র হিসেবেই গড়ে তুলেছেন।

'বিপদ' গল্পে অভাবের তাড়নায় হাজু পতিতাদের খাতায় নাম লিখিয়ে স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করে। এই জীবিকার জন্য বিন্দুমাত্র সংকোচ সে অনুভব করে নি। হাজু একদিন স্ব-গ্রামবাসী লেখককে ডেকে গৃহে আপ্যায়ন করে। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে —

"কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ এ পথে আসায় ওর অন্ন বস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়ে প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা - পিরিচে - যার বাবাও কোনদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা যোগাইল না।"

কোন নীতিত্ব কিংবা সতীত্বের চেয়ে মানীষের সত্তার বিকাশকেই বড় করে দেখে প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে লেখক পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'বাসা' গল্পে লেখক গ্রামীণ অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জেলের ছেলে কানাই খড়গপুরে রেলের চাকুরে। সে কোয়ার্টার পেয়েছে। একদিন কানাইয়ের মা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে দিন অতিবাহিত করত। আজ তারা সচ্ছল। বিভূতিভূষণ খড়গপুরে

বক্তৃতা করতে এসেছিলেন। কানাই লেখককে নিয়ে যায় তার কোয়ার্টারে, সেখানে লেখককে আদর আপ্যায়ন করেন স্ব-গ্রামবাসী বলে। লেখক দেখেন তাদের সচ্ছল জীবন। গ্রাম বাংলার লেখক বিভূতিভূষণ দেখেছেন গ্রামের চেয়ে শহরের জীবনযাত্রা অনেক ভালো। গ্রামে বসে থাকলে কানাই-এর জীবনের এরূপ পরিবর্তন সম্ভব হত না।

ডঃ সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন - "গ্রাম সমাজ যেখানে আবদ্ধ করে রাখে মানুষের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার পথ - সেখানে তিনি সে সমাজ ত্যাগ করবার পক্ষে। কলকারখানা বাড়ছে বলেও এখানে কোনো আক্ষেপ নেই তার।"

'দুর্মতি' গল্পে আমরা দেখতে পাই যে ছোট একটি অন্যায়বোধ কিভাবে মানুষকে তার পরিবার - পরিজনদের থেকে, বিশ্বাসের জায়গাগুলো থেকে সরে আসতে বাধ্য করে এবং তার পরিণাম কি দুঃখজনক হতে পারে। দরিদ্র হরিচরণের স্ত্রী বীণাপাণি ও একটি শিশুপুত্র এই নিয়েই তার সুখী পরিবার। গল্পে বীণাপাণির বাড়িতে তার পিতৃবন্ধু ধনী কৃষ্ণলাল বাবুর আগমন ঘটে এবং উপহার স্বরূপ বীণাপাণিকে দিয়ে গেলেন মূল্যবান একটি ব্রেসলেট। হরিচরণ লোভবশতঃ সেটিকে চুরি করে বসে এবং পত্নীর প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় যে সে সারাদিন গ্রামেই ছিল না কাজেই সে কি করে জানবে। এদিকে বীণাপাণি স্বামীকে সন্ধ্যায় গ্রামেই দেখেছিল। তাই স্বামীর এই অসৎ আচরণ বীণাপাণি আর বিশ্বাস করলেন না। বিশ্বাস ভেঙে যাবার এবং স্বামীর ছলনার আশ্রয় নেবার ভঙ্গি দেখে তার ভেতরের চাপা দুঃখে জ্বর এসে বীনাপাণির মৃত্যু ঘটে এবং অনুশোচনায় ভরে যায় হরিচরণের মন। তাই বীণাপাণির স্মরণে দীর্ঘদিন পরেও হরিচরণের চোখে জল আসে। এইভাবে গল্পকার দুরাচারীর প্রতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'তিরোলের বালা' গল্পে দেখা যায় ভ্রাতৃহত্যার বিষয়। এক সুন্দরী উন্মাদিনী বালিকা তার ভাইকে হত্যা করে। গল্পটিতে ভয়াবহতা ও অনিশ্চয়তা নিয়ে এক শোচনীয় পরিণাম দেখা যায়। হত্যা যেভাবেই হোকনা কেন তা অপ্রত্যাশিত। এই ভাবনার প্রকাশে একটি প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে গল্পটিতে।

'যা চাই, তা ভুল করে চাই, যা পাই তা চাই না।' এই লাইনটির অনুরণন যেন ঘটেছে 'কুয়াশার রঙ' ছোটগল্পটিতে। প্রথম দর্শনেই নায়ক প্রতুলের প্রেম কিভাবে শুরুতেই শেষ হয়ে বাস্তবের ও স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে দূরত্ব তৈরী করছে তা করুণ রসে সিক্ত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভন্ডুল মামার বাড়ি' একটু ভিন্নস্বাদের ছোটগল্প। গ্রামকে ভালোলাগা ও ভালোবাসার দৃষ্টান্তে গল্পটি পূর্ণ। ব্যক্তিত্বকে না হারিয়ে গ্রামকে ভালোবেসে গ্রামের মধ্যে থেকে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত এক প্রতিবাদী চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার।

সারাজীবনে অর্থ ব্যয়ে ভন্ডুল মামা নির্জন জঙ্গলের মধ্যে যে বাড়ি তৈরি করলে তার

স্ত্রী, পুত্ররা কেউই সেখানে এলো না কারণ তারা শহুরে জীবনে অভ্যস্ত গ্রামের শান্ত, স্নিগ্ধ, সরল জীবনে তাদের ভালো লাগেনা। তাই একাকী ভড়ুল মামার স্বজনহীন অবস্থায় মৃত্যু ঘটে। এখানে করুণ রসের সঞ্চার ঘটেছে ভড়ুল মামার মৃত্যুতে এবং অবহেলিত গ্রামের প্রসঙ্গে।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় 'নদীর ধারে বাড়ি' গল্পটিতে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন সুস্থ সম্পর্ক সব সময়েই সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে তোলে এবং সেই সঙ্গে তিনি নাগরিক জীবনের নাগরিক বীভৎসতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। কলকাতার বীভৎস ঝগড়া ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ যদুনাথ ও শ্যামলীর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। যদুনাথ স্থির করে দূর গ্রামে একটি নদীর ধারে তারা বাড়ি কিনে চাষবাস করে জীবন কাটাবে। তাই সব টাকা পয়সা নিয়ে বাড়িটি কিনে যদুকেরানি ও তার স্ত্রী শ্যামলী সেখানে চলে যায়। সেই খোলা মেলা পরিবেশে যেন তারা প্রাণ ফিরে পায়। আর তখন তাদের দুঃখ হয় পীতাম্বর লেনের সেই পচা ড্রেন ও কষ্টের মধ্যে থাকা মানুষগুলোর জন্য।

'কিন্নর দল' গল্পটিতে দেখা যায় গ্রাম্য জীবন ও প্রকৃতির বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক রূপের বিপরীত একটি রূপের। যেখানে আছে গ্রামের সংকীর্ণতা, দলাদলি, কুসংস্কার, ঈর্ষা, বিদ্বেষ এর কুফল। যা কিনা গ্রাম্য জীবনকে বাইরের জগৎ থেকে একেবারে আলাদা করে রেখেছে।

বিভূতিভূষণ লিখেছেন — "আমাদের গ্রামের প্রকৃতি অদ্ভুত, কিন্তু মানুষগুলো বড় খারাপ, পরস্পর ঝগড়া, দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, পারস্পরিক কলহ, জাতিগত বিরোধ, সন্দেহ এতে একেবারে ডুবে আছে।লেখাপড়া বা সৎচর্চার বালাই নেই কারো।" ২০

গ্রামের একজন রূপসী সুগায়িকা কিভাবে, জীবনের মধ্যে বিশেষত নারীসমাজের মধ্যে 'অকরুণ কুটিল ভাবের' রূপান্তর ঘটিয়েছিল, - মুখরা মেয়ে শান্তির জীবনে তারই প্রকাশ ঘটেছে উক্ত ছোটগল্পে। এখানে নাগরিক রুচি, শিক্ষা, সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হয়েছে গ্রাম্য কালচারের নিরিখে।

'জন্ম ও মৃত্যু' গল্পে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ বাস্তবতার পরিচয় মেলে। জন্ম ও মৃত্যু এই দুটি অভিজ্ঞতার মধ্যে পরিস্থিতিগত বৈপরীত্য রয়েছে। একদিকে ধনী বিশ্বনাথবাবুর জন্মদিনকে কেন্দ্র লেখকের নিজস্ব অনুভূতি অন্যদিকে গ্রামের বৃদ্ধা শশী ঠাকুরুণের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লেখকের নিজস্ব উপলব্ধি আলোচ্য গল্পটি তারই অবতারণা।

লেখক গিয়েছিলেন বাড়িভাড়ার খোঁজে বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতে। সে দিনটি ছিল বিশ্বনাথবাবুর জন্মদিন। সাত ছেলে ও চার মেয়ে পুত্রবধূ,ভাই-ভাইবৌ, নাতি-নাতনী, নাতজামাই সকলেই উপস্থিত হয়েছিল এই আড়ম্বরপূর্ণ জন্মদিনে অংশগ্রহণ করতে। বিশ্বনাথবাবুর পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা হাতে ছিল। সকলেরই চোখ ছিল সেদিকে। বিশ্বনাথবাবুর টাকা ছিল বলেই সকলেই তার

বশ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় তার অর্থ কৌলীন্যে, বিভূতিভূষণ এই শ্রেণির অর্থলোভী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এই অভিজ্ঞতা লাভ করার কিছুদিন পর লেখক ফিরে এসেছেন তার স্ব-গ্রামে। সেখানে শুনলেন বৃদ্ধা শশী ঠাকুরুণের মৃত্যু সংবাদ। তার চার ছেলের মধ্যে তিন ছেলে বিদেশে কর্মরত। বড় ছেলে সামান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত এজন্য তাকে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাতে হ'ত। রোজগেরে ভাইরা বড় ভাই ও মাকে দেখে না। অর্থলোভী ভাইরা মাকে টাকা পাঠায় না এমনকি মার খোঁজখবর রাখে না। সহায় সম্বলহীনা বৃদ্ধা থালা বাটি বিক্রয় করে বহু কষ্টে বড় ছেলের সংসার চালাবার পর মারা যান। মায়ের মৃত্যুতে সব ছেলেরা উপস্থিত থেকে বিপুল অর্থব্যয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে। মা জীবিতকালে যারা একটি টাকাও দেয়নি তাদের কাছে দামী হয়ে উঠেছিল আড়ম্বরপূর্ণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। এই গল্পটি পাঠ করে আমাদের প্রাণ মন বিষিয়ে ওঠে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি মূল্যবোধের চেহারাকে ভেবে দেখবার, উপভোগ করবার গল্প এটি। এর মধ্যে লেখক বড় মাপের জীবনদর্শনকে তুলে ধরে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। এই গল্পে আমরা দেখি লেখককে আস্বাদনপন্থী জীবনের উপভোক্তা হিসেবে।

'নাস্তিক' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র লোকনাথ। জৈন সন্ন্যাসী লোকনাথ পন্ডিত হলেও সে ছিল নাস্তিক। বিশ্বরহস্যের কোন সন্ধান সে পায়নি এজন্য তার জীবনে এসেছে নৈরাশ্যবোধ - "সবদিকেই অন্ধকার, কোনো দিক থেকে কোনো আলোক আসার চিহ্ন দেখা যায় না।"

মৃত্যুর মুহূর্তে লোকনাথের জীবনের ট্রাজেডি ঘনীভূত হয়েছে। একটি বালিকাকে সে নির্যাতন করেছে - এই গভীর বেদনায় সে মর্মাহত - "পথের বাঁকে একদিনের মেঘভরা বৈকালে মেয়েটিকে কে খুব মেরেছে, তার এলোমেলো চুলগুলি মুখের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে সে কেঁদে কেঁদে ফুঁপিয়ে বলছে কেন তুমি মারবে ? .....কেন আমায় মারবে ? .....এ পাড়ায় আসি বলে ? .....আর কক্খনো আসব না..... দেখে নিও, আর কক্খনো যদি আসি....."

এক অভিমান বঞ্চিতার কান্নার বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদ এই গল্পে ধ্বনিত হয়েছে।

'দ্রবময়ীর কাশীবাস' বিভূতিভূষণের অন্যতম ছোটগল্প, দ্রবময়ী বৃদ্ধা - গৃহে নাতি-নাতনীদের দ্বারা উপেক্ষিতা। সে তার জন্মভূমি ছেড়ে কাশীবাস করতে এসেছে। কাশীতে এসে সে দেখেছে জগন্নাথ বিগ্রহের মধ্যে অলাবু! কথকঠাকুর যখন দিব্যলোক প্রাপ্তির মাহাত্ম্য শোনাচ্ছেন তখন - "দ্রবঠাকুরুণের মন অনেকদূরে চলে গেল। তাঁর গাছে কত কাঁঠাল হয়েছে এই আষাঢ় মাসে বড্ড কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে আমগাছে আমও নিশ্চয় খুব

ধরেছিল.....বারো ভূতে লুটে পুটে খাচ্ছে।" এরপর দ্রবময়ী কাশী ছেড়ে চলে এলো গ্রামে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন — "দ্রবময়ীর কাশীবাস হয়নি - কিন্তু সহজ জীবনের পুণ্যক্ষেত্রে স্বামীর ভিটায়, গরু-গাছপালা, লতাপাতার প্রীতিতে, প্রতিবেশীদের স্নেহ ভালোবাসাতেই তার মোক্ষলাভ ঘটেছে।"

বিভূতিভূষণ এই গল্পে এই সত্যই প্রকাশ করেছেন মুক্তি লাভ করতে গেলে জীবনের মায়া মমতা ত্যাগ করে যাবার প্রয়োজন হয় না। জীবন বিমুখতার বিরুদ্ধে 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' ছোটগল্পে বিভূতিভূষণ প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'কুশল পাহাড়ী' গল্পেও লেখক এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অসাম্প্রদায়িকতার সার্থক নিদর্শন হিসেবে বিভূতিভূষণের 'আহ্বান' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। বাৎসল্য রসযুক্ত এই গল্পে ধর্ম, সমাজ ও শ্রেণিগত বৈষম্যের কোন স্থান নেই। মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন হল সবচেয়ে বড়।

আলোচ্য গল্পের বক্তা এক মুসলমান বৃদ্ধাকে কৃপা করে কিছু অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন। দুঃসময়ে এই অর্থ পেয়ে বক্তার প্রতি বৃদ্ধার গভীর স্নেহের উদ্রেক হল, যদিও বক্তা বৃদ্ধার আচরণে খুব একটা প্রীত ছিল না। মাঝে মাঝে রূঢ় ব্যবহারও করেছেন কিন্তু বুড়ির 'আমার গোপাল' বলে এই স্নেহপূর্ণ ডাক অপূর্ব পবিত্র মাতৃস্নেহ ধারায় অভিসিক্ত হয়েছিল। এই মুসলমান বৃদ্ধার প্রতি অলৌকিক আকর্ষণ বশতঃ তার মৃত্যুর পর গ্রামে ফিরে এসে সে বৃদ্ধার কবরে এক কোদাল মাটি ও কাফনের কাপড় কিনে দিয়েছেন। বক্তার সংবেদনশীল মন হাহাকার করে উঠেছিল 'আমার গোপাল' এই ডাক শোনার জন্য। স্নেহ ভালোবাসার কাছে জাতি-ভেদ, ঐশ্বর্য গৌণ। সাম্প্রদায়িক বিভেদও গৌণ এই সত্যটি আলোচ্য গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন।

এবার বলফুলের গল্পের আলোচনা করব। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম 'বনফুল',বাংলা গল্প জগতের এক সার্থক স্রষ্টা ও শিল্পী। তিনি জীবন রহস্য সন্ধানে এবং বাস্তব জীবনের সার্থক রূপকার। বৃত্তি সূত্রে চিকিৎসক হয়েও বিচিত্র স্বাদের গল্প রচনা করেছেন। তিনি সমাজের শোষণ, বঞ্চনা, ভন্ডামি নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তার বৈচিত্র্যপূর্ণ ছোটগল্পে সমাজ সমস্যা ও ব্যঙ্গের অবস্থান পাশাপাশি। তাঁর প্রতিবাদী চেতনামূলক গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

তাঁর প্রতিবাদী গল্পগুলির মধ্যে 'ছোটলোক', 'অনুবীক্ষণ', 'শ্রীপতি সামন্ত','বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী', 'ছুড়িটা', 'ব্যবধান', 'ভক্তিভজন' 'ঐরাবত', 'ছেলেমেয়ে', 'শালা', 'ক্যানভাসার', 'যুগান্তর', 'দোলের দিনে' 'অপূর্ব বিজ্ঞান', 'বর্ণে বর্ণে', 'সেকালের রায়বাহাদুর',

'পক্ষীপুরাণ', 'সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ','মাধব মুখুজ্যে', 'বুর্জোয়া প্রলেটারিয়েট', 'ঝুলনপূর্ণিমা' 'ব্যাচারাম বাবু, 'নমুনা', 'ব্যতিক্রম', 'ট্রেনে', 'পাশাপাশি' ও 'উৎসবের ইতিহাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বনফুল সমাজসচেতন শিল্পী। সমাজের অসঙ্গতিগুলিকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং তার বিরুদ্ধে জানিয়েছেন প্রতিবাদ। তাঁর 'ছোটলোক' একটি প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিবাদী গল্প। কংগ্রেসী জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী অন্তঃসারশূন্য রাঘব সরকার মধ্যবিত্তিয় শ্রেণিভুক্ত চরিত্র। তিনি শিক্ষিত ও পরোপকারী। পরণে তার খদ্দরের পোশাক। গল্পের অপর চরিত্রটি হলো এক হত দরিদ্র নীচু তলার লোক। সে রাঘব সরকারকে ভাড়া পাবে বলে রিক্সা চাই কিনা জিজ্ঞেস করলে প্রথমে 'না চাই না' একথা বলে। এরপর রিক্সাওয়ালার প্রতি করুণা বশত রিক্সা ডেকে ভাড়া করে তাতে না চেপে হনহন করে হেঁটে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যান। তারপর রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দিতে গেলে সে শ্রম ব্যতীত পয়সা নেয় নি। অহংকারী রাঘবসরকারের আচরণে নিচুতলার মানুষের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়েছে। তার দান করবার মানসিকতার মধ্যে কোন শ্রদ্ধা বা সম্মান ছিল না, ছিল একমাত্র আত্মবোধ যা ভদ্রলোকের তুলনায় অনেক বেশি।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বনফুলের প্রতিবাদ বহু ছোটগল্পে থাকলেও 'ভক্তিভাজন'ছোটগল্পে নির্লোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণের বংশমর্যাদাকে বড় করে দেখেছেন। অভাব অনটন হতাশা থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্রের গৃহের অন্ন গ্রহণ করেন নি। তার কাছে বংশ মর্যাদাই ছিল বড়।

স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে বনফুল প্রতিবাদ জানিয়েছেন 'ব্যবধান' গল্পে। এই গল্পের নায়ক সুরথবাবু। সে আদর্শভ্রষ্ট যুবক, পিতার উপদেশ সে মেনে চলেনা। কিন্তু পিতার অর্থের প্রতি তার লোভ ছিল বেশি। পিতা লটারীতে টাকা পেলে পুত্রকে সেই টাকা দিতে গিয়ে দেখে পুত্র মদ্যপান করে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পড়ে আছে। পুত্রের এই অধঃপতনের জন্য পিতা উক্ত টাকা পুত্রকে না দিয়ে এক সৎ প্রতিষ্ঠানে দান করে দেয়। এই সংবাদ পাবার পর মদ্যপায়ী পুত্র পিতাকে খুঁজতে থাকে কেননা এতগুলো টাকার লোভ সে কোনভাবেই ছাড়তে পারেনি। অর্থলোভী, আদর্শভ্রষ্ট, স্বার্থপর, মদ্যপায়ী চরিত্রের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'ছুড়িটা' গল্পে লম্পট দেশনেতার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এক চরিত্রহীন, ভন্ড, দেশনেতা কলকাতার মহাজাতি সদনে বক্তৃতা দিচ্ছেন - "আমাদের সকলকে চরিত্রবান হতে হবে, চরিত্রই আমদের মূলধন।"

বাক্ সর্বস্ব দেশনেতারা মুখে বলেন আদর্শের কথা কাজে করেন অন্যরূপ। দেশনেতার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল তারই ব্যভিচারের ফসল অর্থাৎ তারই ঔরসজাত অবৈধ সন্তান মেয়েটি। -

সে ভিক্ষে করতে করতে ক্লান্ত হয়ে মহাজাতি সদনের দিকে গিয়েছিল। এ ধরনের

ভন্ড দেশনেতাদের মুখোশ বনফুল খুলে দিয়েছেন তাঁর রচিত গল্পে।

ভীষণ জৈবিক আকুতির বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদী গল্প 'বুধনী।' বুধনীকে একদিন দেখতে পায় এক আদিবাসী ছেলে বিল্টু। তারপর উভয়ের মধ্যে প্রেম তা থেকে বিবাহ হয়ে যায়। দুবছর ধরে তারা বর্বর প্রণয়লীলা চালায়। একে অপরকে ছাড়া একমুহূর্ত থাকে নি। সেই বুধনী যখন অন্তঃসত্ত্বা হল, পরে জন্ম দিল এক শিশুকে, তখন বিল্টু দেখল বুধনীর সঙ্গে তার জৈবিক প্রেমে ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে বরং বুধনী কোলের শিশুটিকে উজাড় করে দিয়েছে তার স্নেহ ভালোবাসা ও বাৎসল্য। বিল্টু ভাবছে বুধনী আগের মতো নেই, বুধনী তাকে ভালোবাসছে না। জৈবিক ক্ষুধায় তাড়িত বিল্টু ছেলেটিকে ক্রোধবশত হত্যা করে বসল। বিল্টুর বিচার হল, বিচারে তার ফাঁসির দন্ডাদেশ হয়। মৃত্যুর আগে সে বুধনীর নাম বারবার উচ্চারণ করেছিল। বুধনীর প্রতি তার একরকমের গভীর প্রেম থাকলেও বিল্টু কারোও সহানুভূতি পায়নি। নারীর সাফল্য মাতৃমূর্তিতে, বুধনী তারই প্রতিনিধি। বুধনী চরিত্রের গৌরব এবং বিল্টু চরিত্রের পশুসুলভ আচরণ, দুই বিপরীতধর্মী চরিত্র বনফুলের কলমে সার্থক হয়ে উঠেছে।

বনফুলের 'চৌধুরী' গল্পের নায়ক কংসারী চৌধুরী। সে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবই করতে পারে। ঘুস নেওয়া, জালিয়াতি, লোকঠকানো সব কাজে তার জুরি মেলা ভার। কংসারী চৌধুরী কখনও হার মানে নি। কিন্তু যেদিন সে অন্ধ হয়ে গেল, কোন চক্ষু চিকিৎসক তার চোখ ভালো করতে পারলো না সেদিন রিভলবার দিয়ে চোখে গুলিবিদ্ধ করে সে আত্মহত্যা করল। মৃত্যুর উপর এরূপ অপরাজেয় পৌরুষ ও জেদি মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। লেখক এরূপ চরিত্রকে ভালো চোখে দেখেন নি।

'বীরেন্দ্রনারায়ণ' বনফুলের একটি চরিত্র প্রধান গল্প। এই গল্পে বীরেন্দ্রনারায়ণের চরিত্রে পরস্পর বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বীরেন্দ্রনারায়ণ জালিয়াতি, অত্যাচারী, নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন হীন কাজে অভ্যস্ত। একদিন জমিদার ডেকে আনতে বলে ডাক্তারকে। জমিদারের ছেলে ছিল সাংঘাতিক অপরাধে অপরাধী। ডাক্তারকে মিথ্যে সার্টিফিকেট দিতে হবে এ খবর জানালে ডাক্তার সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেন। সত্যাশ্রয়ী ডাক্তার কোন ভয়ের কাছে মাথা নত করেন নি। এরপর জমিদার ডাক্তারকে সেই গ্রাম ছেড়ে দেবার হুমকি দেয়। নিজ সম্মান রক্ষার্থে ডাক্তার গ্রাম ছাড়তে প্রস্তুত। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এক গরুর গাড়ীতে তুলে যখন যাত্রা করবেন তেমন সময়ে বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘোড়ায় চেপে এসে ডাক্তারের গতি রুদ্ধ করে ডাক্তারকে গ্রাম ছেড়ে না যাবার অনুরোধ করল। বীরেন্দ্রনারায়ণ জানাল সে সার্টিফিকেট অন্য ডাক্তারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে কিন্তু এরূপ সৎ আদর্শবান ডাক্তার গ্রামে আর একটিও পাওয়া যাবে না। এইভাবে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান জানিয়েছে জমিদার।

বনফুলের 'অনুবীক্ষণ' একটি সফল প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পটি রচিত হয়েছে প্রধান তিনটি চরিত্র অবলম্বন করে। একজন সুদর্শন পন্ডিত বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ বহু ভাষাবিদ - দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তার রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল তিনি সিফিলিস ও গনোরিয়া নামে যৌন রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত। পান্ডিত্যের আড়ালে তার চরিত্রের নীচতা ও অসংযমীর পরিচয় মেলে। বনফুল ভদ্রবেশী, অসৎ, চরিত্রহীন পন্ডিতের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার প্রদর্শন করেছেন।

অন্যদিকে কুৎসিত চেহারার একটি লোক, যার নাম শশধর - বাইরে থেকে তাকে মনে হচ্ছিল যে সে সিফিলিস কিংবা গনোরিয়া রোগে আক্রান্ত। তার ঠোঁটে দগদগে ঘা। কিন্তু রক্তপরীক্ষা করে ডাক্তার দেখলেন তার রক্তে কোন দোষ নেই - সে কোন যৌন রোগেও আক্রান্ত নয়।

বাইরের পোশাক পরিচ্ছদে, চাকচিক্য কিংবা সুন্দর মনে হলেও তার মধ্যে অসুন্দর মন বিরাজ করে আর কুৎসিত, কদর্য বলে মনে হলেও সে যে চরিত্রবান হতে পারে এরূপ ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন এই গল্পে। বহিরঙ্গ দেখে কাউকে মূল্যায়ন করা উচিত নয় এই সত্য কথাটিই লেখক 'অনুবীক্ষণ' গল্পে তুলে ধরেছেন।

উচ্চশিক্ষিত কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ আত্ম অহংকারী চরিত্রের প্রতি বনফুলের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে 'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পে। শ্রীপতি সামন্ত সাধারণ পোশাক পরিহিত একজন ট্রেনের যাত্রী। সে রেলের নির্দিষ্ট টিকিট করে ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরায় উঠতে গেলে এক ইংরেজী বুলিওয়ালা যুবক শ্রীপতিকে ট্রেনের কামরায় উঠতে বাধা দিয়েছিল, অবজ্ঞা করেছিল এই নিরীহ লোকটিকে। কিন্তু রেলের টি.টি. যখন ট্রেনে টিকিট অনুসন্ধান করছিল তখন দেখা গেল যুবকটি রেলের টিকিট করেনি বিনা টিকিটের যাত্রী হয়ে প্রথম শ্রেণির কামরায় আরামে বসে ছিল। টি.টি. তাকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বললে শ্রীপতি তাকে অপমান ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য টি.টি. কে নিজেই টাকা দিয়ে যুবকটির সম্মান রক্ষা করেছিল। অথচ এই যুবকটি শ্রীপতির প্রতি পশুর মতো আচরণ করেছিল, ট্রেনে উঠতে দিতে চায়নি, মানবিক মূল্যবোধের সামান্য পরিচয়ও সে দিতে শেখেনি, অথচ প্রৌঢ় শ্রীপতি তার প্রতি যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার বিষয়।

'অনির্বচনীয়' গল্পে ক্ষণিকা দোজ বরের সঙ্গে বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, এমনকি এরূপ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ করলে সে আত্মহত্যা করবে এরকম সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। তার বান্ধবী সুজাতাকে জানিয়েছিল — পুরুষরা সিগারেটের মত মনে করে মেয়েদের। একটি শেষ হতেই, না নিভতেই, আবার বিবাহের হোমের জন্য আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত। কাজেই এরূপ বিবাহ আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এরপর জানা গেল, ক্ষণিকা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে তার

সঙ্গেই সুজাতার বিয়ে হয়ে গেল। তার কিছুদিন পর সুজাতা আত্মহত্যা করে। সেই ক্ষণিকাই আবার 'লাভ ম্যারেজ' করেছে অজয় বসুর সঙ্গে। নারী মনস্তত্ত্ব প্রধান অনির্বচনীয় ছোটগল্পে নারীর দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে বনফুল প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

অদম্য কামনা বাসনার বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় মেলে 'ঐরাবত' গল্পে। এই গল্পের দুটি নারী চরিত্র হল আন্নাকালী ও নমিতা। তারা দুজনেই সন্তানসম্ভবা। বৈচিত্র্যহীন হাসপাতালের মুখোমুখি দুটি বেডে তারা শুয়ে থেকে পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক কথা বলে যাচ্ছে। পুরুষরা সব অপকীর্তির নায়ক, স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, অহংকারী এবং স্ত্রীর উপর নির্যাতনকারী। শুধু তাই নয় নিজের বউ থাকতেও পরনারীতে আসক্ত, মদ, আফিং, ভাঙ ও সিগারেট খেতেও তারা অভ্যস্ত। তারা আড্ডাবাজ মিথ্যেবাদী। পুরুষদের দৃষ্টি শুধু সুন্দরী মেয়েদের দিকে। পাশাপাশি নারীরা সর্বংসহা, ত্যাগী, রান্না করা, সেবা করা এগুলো তাদের কাজ। অথচ পুরুষদের চোখে নারীর কোন দামই নেই।

আন্নাকালী নমিতাকে বলেছে যে — "অমন নেমকহারাম জাত আর আছে নাকি। এই ধর না, যে ছেলেকে পেটে ধরে বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করি আমরা সেই ছেলেই বিয়ে করে একেবারে পর, মায়ের দিকে ফিরেও চায়না।" এভাবে পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এরপর হাসপাতালে একই তারিখে আন্নাকালী ও নমিতার সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। সাত কন্যা সন্তানের জননী আন্নাকালীর হল একটি কন্যা সন্তান। নমিতার কোলে প্রথম পুত্রসন্তান এল। এই সংবাদ আন্নাকালী জেনে আন্নাকালীর মুখ হল বিবর্ণ, সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। নমিতার পুত্রসন্তান হয়েছে এই সংবাদ শুনে আন্নাকালী জোরের সঙ্গে নার্সদের জানিয়েছে তার সন্তান অদল বদল হয়েছে। তার মেয়ে হতেই পারে না। কেননা জ্যোতিষ বলে দিয়েছিল তার ছেলে হবে। সে চিৎকার করে বলল — "আমার ছেলে এনে দাও নিশ্চই আমার ছেলে হয়েছে।" হাসপাতালে যখন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল সেসময় নমিতা সভয়ে তার পুত্রকে কোলে তুলে নিল। এটি বনফুলের শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক গল্প।

স্বামী ও স্ত্রীর মধুর প্রেমে যখন আঘাত আসে তখন নারী জীবনের গভীর যন্ত্রণা অনুভূত হয়। নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি এবং পুরুষজাতির বিবাহ লোলুপতার বিরুদ্ধে বনফুল প্রতিবাদ জানিয়েছেন 'অদ্বিতীয়া' গল্পে। এই গল্পে প্রভাবতী দেবী ছ'টি পুত্র ও কন্যা সন্তানের জননী। সপ্তম সন্তান আসবার আগে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পিতৃগৃহে। তার পরেরটি পুত্র সন্তান হল। এদিকে তার শ্যালিকা জামাইবাবুকে জানালো সন্তান জন্ম দিয়ে প্রভাবতী দেবী মারা গিয়েছে। এ অবস্থায় শ্যালিকা দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব দেয়। শ্যালিকা দুমাস যেতে না যেতেই বিয়ের সব ব্যবস্থা

করে রাখে। বিয়ের দিন কৌশল করে শ্যালিকা একটি ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে এনেছিল। পাশের ঘরে প্রভাবতী তার সাতটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে সেজেগুজে বসে রয়েছে। স্বামীর এই বিড়ম্বনা আমাদের কাছে উপভোগ্য মনে হলেও নারীমনের বেদনাকে এবং পুরুষের নারী জাতির প্রতি অমর্যাদাকে লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'যুগান্তর' গল্পে নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে,'দত্তমহাশয়' ছোটগল্পে সুদখোর দত্ত মহাশয়ের বিরুদ্ধে, 'দোলের দিনে' গল্পে মেকি আভিজাত্যের বিরুদ্ধে ইংরেজভক্ত রায়বাহাদুরের বিরুদ্ধে, 'অপূর্ব বিজ্ঞান' গল্পে দোদুল্যমান মেরুদন্ডহীন লোকের বিরুদ্ধে, 'পক্ষীপুরাণ' গল্পে অপরিণামদর্শী বাঙালির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'সনাতন পুরের অধিবাসীবৃন্দ' গল্পটিতে সংকীর্ণ জীবনে অভ্যস্ত পল্লী বাংলার চিত্র তুলে ধরেছেন। এক নির্দোষ প্রবীন লোকের চরিত্র নিয়ে গ্রামবাসীদের মুখোরোচক গল্প কিভাবে তার মৃত্যু ঘটালো তারই একটি করুণ কাহিনী রয়েছে এই গল্পটিতে। বনফুল এই গল্পটির মধ্যদিয়ে নিষ্কর্মা নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন গন্ডীবদ্ধ পল্লীবাংলার মানুষগুলোর কর্মকান্ডের প্রতি প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'মাধব মুখুজ্জে' 'বুর্জোয়া প্রোলেটারিয়েট', 'অমলা' 'বর্ণে বর্ণে' প্রভৃতি গল্প পণপ্রথা, পাত্রী নির্বাচনের নাটক, মেয়েদের বিবাহ সমস্যা ও নিম্ন মধ্যবিত্ত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুর্গতি এইসব বিষয়কে কেন্দ্র করে বনফুল এই গল্পগুলো রচনা করেছেন।

'অমলা' গল্পে অমলা চেয়েছিল স্বাস্থ্যবান, সুন্দর সুপুরুষ বর। কিন্তু মধ্যবিত্ত কন্যার এই চাওয়া টিকলো না কারণ দাম দরে ঠিত হওয়ারও একটা ব্যাপার ছিল। তাই তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। সে মোটা, কালো সওদাগরী অফিসের এক কর্মচারীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ তার সাথে দরে বনেছিল। এই যে মেয়েদেরকে দরদাম করে পণ্যে পরিণত করবার ব্যবস্থা, এর বিরুদ্ধে লেখক ছিলেন সরব।

'বর্ণে বর্ণে' গল্পে লেখক ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তৃতীয় বিয়েতে ইচ্ছুক পাত্র কালো বর্ণের মেয়েদের নাকোচ করে নিজের জন্য নির্বাচন করলেন বাদামী বর্ণের পাত্রীকে । অর্থাৎ সমাজে মেয়েদের যে গাত্রবর্ণ পর্যন্ত চর্চার বিষয়, গাত্রবর্ণ ভেদে মেয়েদেরকে নির্বাচন করার এই যে প্রথা তাই লেখক দেখিয়েছেন।

'ঝুলন পূর্ণিমা' গল্পে দেখা যায় একজন পিতা অসবর্ণ পাত্র নিখিল অপেক্ষা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত প্রৌঢ় স্ববর্ণ মহেন্দ্র গাঙ্গুলীকে জামাই হিসেবে নির্বাচন করলে শিক্ষিত কথা আপত্তি জানায়। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহে নিখিলের ভীরুতা দেখে তারা দুজনেই ঝুলন পূর্ণিমার দিনে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এখানে বর্ণবিদ্বেষকে লেখক তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কথা ও নিখিলের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। অসবর্ণ বিয়ে আমাদের সমাজে

কিভাবে আস্ত আস্তে গৃহীত হচ্ছে তার পরিচয় পাওয়া যায় 'ভূত' নামক গল্পে।

'বেচারামবাবু' গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙনের চিত্র ফুটে উঠেছে এবং স্বল্প আয়ে সংসার চালানোর যে চিন্তা তা কিভাবে মানুষকে গ্রাস করে চলেছে তাই আলোচ্য গল্পে দেখানো হয়েছে।

আজকের দিনে বেকারত্ব যে এক মহাসমস্যা তার পরিচয় রয়েছে 'পাশাপাশি' ও 'উৎসবের ইতিহাস' গল্পে। এছাড়াও 'দোলের দিনে', 'নমুনা, 'দর্জি', 'ব্যতিক্রম', প্রভৃতি গল্পে বনফুল সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রতিবাদের সুরে।

'ভোটার সাবিত্রীবালা' গল্পে বনফুল সমাজের অন্যায় অবিচার ও ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সাবিত্রীবালা এই ছোটগল্পের প্রধান নারী চরিত্র। তার স্বামী পন্ডিত হলেও স্ত্রী -পুত্রের ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। পুত্র তমোনাশ ও রিপুনাশ এই দুই নামকরণের মধ্যে ব্যঞ্জনা নিহিত। তমোনাশ অর্থাৎ অন্ধকার বিনাশকারী, রিপুনাশ অর্থাৎ শত্রু বিনাশকারী, এরূপ নামকরণ করলেও তারা সমাজের কোন হিতসাধন করতে পারেনি। তমোনাশ অর্থাভাবে পড়াশুনো করতে পারেনি। অসৎ সঙ্গে পড়ে তাকে মরতে হয়েছিল পুলিশের গুলিতে। এমনকি সাবিত্রীবালা পুত্রের সৎকারের অর্থটুকুও দিতে পারে নি। স্বামীর মৃত্যুর পর ছোট পুত্র রিপুনাশ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়। ডিম, মাছ, মাংস, ফল এগুলো ডাক্তার খেতে বলে কিন্তু মা সাবিত্রীবালা তার কিছুই ছেলের জন্য কিনে দিতে পারেনি।

ভোট যখন আসন্ন ভোটপ্রার্থীরা ভোট চাইতে এসেছিল সাবিত্রীবালার কাছে। সাবিত্রীবালা অগ্নিশর্মা হয়ে ভোট প্রার্থীকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন — "আপনাকে ভোট দেব ? কী উপকার করেছেন আপনি আমার ? আপনি যখন গদিতে ছিলেন তখন আমার বিদ্বান স্বামী সামান্য ভিখিরির মতো মারা গেছেন। আমার বড়ো ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারিনি, শেষে সে গুন্ডা হয়ে ছুরির ঘায়ে মারা গেল।

ছোট ছেলে গেল যক্ষ্মায়, তার কোন চিকিৎসা হলনা। সর্বত্র ঘুষ চায়। আপনাদের ভোট দেব কেন ? কাউকেই ভোট দেব না।. . . . . বেরিয়ে জান বাড়ি থেকে .. . . . . দড়াম করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিল সাবিত্রী।"

ভোটার সাবিত্রীবালার এই প্রতিবাদ শুধুমাত্র ভোট প্রার্থীদের বিরুদ্ধেই নয়, সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বিরুদ্ধেও তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

বনফুলের 'মণিকাঞ্চন' গল্পে প্রশাসনের আইনি ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে ও সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন গল্পের নায়ক সাধন বাবু।

এছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের শোষণ ও ভন্ডামির বিরুদ্ধে বনফুলের প্রতিবাদী কণ্ঠ

উচ্চারিত হয়েছে 'দেশদরদী কেনারামের রোজনামচা' গল্পে। দেশদরদের নামে স্বার্থপরতা, স্বজনপোষণ নীতির বিরুদ্ধে এই গল্পে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে।

'নিমগাছ' গল্পে পারিবারিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। যে স্ত্রী সংসারের জন্য সব কিছু মেনে নিয়েছে তাকে শোষণ করে তাকে দিয়ে অত্যধিক শ্রম করিয়ে নিয়েও তার যথোচিত মূল্য দেয়নি যে পরিবার তাদের বিরুদ্ধে গৃহকর্মে নিপুণা লক্ষ্মী প্রতিমাতুল্য বধূটি প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছে।

'জাগ্রতদেবতা' গল্পে বনফুল অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গ্রামের একটি পুরনো মন্দির রয়েছে সেই মন্দিরে মহাদেবের বিগ্রহ রাখা হয়েছে। এই মহাদেবই জাগ্রত দেবতা। তাঁর কৃপাতেই লটারিতে টাকা পাওয়া পাওয়া ব্যবসায় উন্নতি, রোগমুক্তি, মামলা-মোকদ্দমা জেতা সম্ভব হয়। এছাড়া এই গ্রামের একটা প্রচলিত বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল প্রতিবছর বাৎসরিক পূজা উৎসবে একজন পাগল হয়ে যেতো। দেবতার মহিমাতেই এটা সম্ভব বলে তারা মনে করত। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষদের অন্ধবিশ্বাস ও অশিক্ষার কারণে এরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। দেবতার মহিমা অসীম তিনি কারো ভালো করেন কারও মন্দ করেন। অলৌকিক ও অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

' বিরুজু রমা' বনফুলের একটি অন্যতম গল্প। চিরকুমারী বিরজুর মা'র মধ্যে মাতৃত্বের প্রকাশ ঘটেছে। বিরজুর বাবার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েও ভেঙে যায়। বিরজুর বাবা নতুন বিয়ে করে। বিরজুকে জন্মদেবার পর বিরজুকে তার মায়ের তত্ত্বাবোধানে রেখে যান। সে কালো গরুর দুধ বিক্রি করত বিভিন্ন বাড়িতে এবং প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিরজুর মা'র ছেলের নাম হকরু। তার বিয়ে হয়েছে। বৌটি আসার পর হকরু বউ এর কথা শুনেই চলত। তার মায়ের প্রতি কোন দায়িত্ব সে পালন করেনি। গর্ভধারিণী মা পুত্রের এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তবে এই চরিত্রের একটি মহৎ দিক হল সে গ্রামের সকলের মা। প্রত্যেক বছর পূজার সময় সে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপহার দিত।

'দুধের দাম' বনফুলের একটি অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। এক বৃদ্ধা ট্রেনে উঠতে গিয়ে যাত্রীদের দ্বারা কিভাবে অবহেলা, অপমান ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ সহ্য করেছে তার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বৃদ্ধা পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। এজন্য তার পক্ষে এককভাবে ট্রেন থেকে নামা সম্ভব হয়নি। সে যাত্রীদের অনুরোধ করে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু কেই তার কথা শোনেনি। অনেকে তাকে ভিখিরী, অশিক্ষিত ও টিকিট বিহীন যাত্রী বলেছে। আসলে সে ভিখিরী নয়। তার সেকেণ্ড ক্লাস এর টিকিট আছে। বেথুন স্কুলে পড়া এই শিক্ষিতা বৃদ্ধাটি বাংলা, ইংরাজি ও হিন্দি এই তিনটি ভাষায় বিশেষ দক্ষ।

তখন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল একটি কুলি। যে কুলিটি তাকে প্রথম শ্রেণির প্রতীক্ষালয়ে বসিয়ে দিয়েছিল এবং গয়াগামী ট্রেনেও তুলে দিয়েছিল। তাকে যেভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিল অন্যান্য যাত্রীরা তা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক। অভিজ্ঞতা সূত্রে বৃদ্ধাটি দেখেছে কয়েকজন সুবেসা সুতন্বী ও সুরূপা মেয়ে যখন ট্রেনে উঠেছিল তখন যাত্রীরা তাদের প্রতি সুমিষ্ট ব্যবহার করেছে। রূপ ও সৌন্দর্যহীন বৃদ্ধা সেই ব্যবহার পায়নি। নারী চরিত্রে প্রতি যাত্রীদের এই পক্ষপাতের বিরুদ্ধেও বনফুল পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গল্প সূত্রে আমরা জানতে পারি কুলিটি বৃদ্ধাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছিল সে সময় বৃদ্ধাটি তার মহানুভবতার জন্য তাকে দু'টাকা দিয়েছে। কুলিটি আট আনার বেশি নিতে চায়নি। তখন বৃদ্ধাটি কুলিটিকে বলেছে —

"তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করেছো। আমি তো তোমাকে দুধ খাওয়াই নি দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা। দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" এরমধ্যে চিরন্তন মায়ের ছবি আমরা খুঁজে পাই। যার মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন কোন ভেদাভেদ নেই।

'তিলোত্তমা' বনফুলের অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পের নায়িকা তিলোত্তমা দেখতে সুরূপা নয়। তার গায়ের রঙ তিলের মত কুচকুচে কালো। তার বাবা তিলোত্তমাকে বিয়ে দিয়েছে কিন্তু শর্ত অনুসারে বিয়ের পণ যথাযথ দিতে পারেন নি এই অভিযোগে তার লোভী শ্বশুর শাশুড়ি তিলোত্তমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেনি। তিলোত্তমার শ্বাশুড়ি পুত্রবধূকে পেত্নীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শ্বশুর-শাশুড়ি ঘোষণা করেছে তারা ছেলেকে আবার বিয়ে দেবে। বস্তুত ছেলের পুনর্বিবাহের আয়োজন করে। ঊষার সঙ্গে আবার বিয়েও হয়। বিয়েতে দশ হাজার টাকা, প্রচুর গয়নাপত্র পায়। ঊষার মায়ের কলঙ্কের কথা জানা থাকলেও নকুল নন্দীর লোভ ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির জন্য সে কলঙ্কও ঢাকা পড়েছিল। তিলুকে তার স্বামী গোকুল জিজ্ঞাসা করেছিল যে দ্বিতীয়বার বিয়েতে তার কোন আপত্তি আছে কিনা. তিলোত্তমা 'না' বলে নীরবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। স্বামী সেবা, বাসন মাজা, কাপড়কাঁচা, ঘর গেরস্থালের কাজ নীরবে করে যেত। ঊষা গোকুলকে একটি শর্ত দিয়েছিল — "তিলোত্তমাকে জন্মের মত বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে।"

তিলোত্তমা তার পিত্রালয়ে গিয়েছে কিন্তু যাবার আগে সে অনুরোধ করে গিয়েছিল অন্তত বছরে এক আধবার যাতে দেখা করতে পারে। এভাবে অর্থলোলুপ মানুষের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

কল্লোল গোষ্ঠীর পুরোধা রবীন্দ্র পরবর্তী গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন -

"বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রই বাংলাদেশে দ্বিতীয় শিল্পী - যিনি গল্পে

এবং কবিতায় সমুন্নত শীর্ষবিহার করেছেন।"

কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের ভাবনা ছিল - "জীবনানন্দের ভাষায় নষ্ট শশা, পচা চালকুমড়ার ছাঁচের এই জীবনবৃত্তের ওপারে আর এক সৌন্দর্য প্রোজ্জ্বল সার্থকতা- যার স্বাদ 'গভীর - গভীর।' তাঁদের এক চোখে অশ্রু, এক চোখে জ্বালা আর শিল্পীর তৃতীয় নয়নে সুন্দরের ধ্যানমূর্তি।"

তিনি মানষের সুখ-দুঃখের বাস্তব গুণকে ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। প্রেম-প্রতিহিংসা ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, শাশ্বত জীবনবোধ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব চিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের মুখ্য বিষয়। নাগরিক জীবনের অন্যতম কথাকার প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- "দুঃখও দেখছি বটে, দেখছি কদর্যতা। মার চোখের জল দেখেছি, গলিত কুষ্ঠ দেখেছি, দেখেছি লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের হিংসা, কদাকার অহংকার, উন্মাদ বিকলাঙ্গ রুগ্ন গলিত শব, তবু —

"দ্বার খোল, খোল দ্বার, রাত্রির প্রহরী, ...এ দেখেও আবার যখন শান্ত সন্ধ্যায় ঝাপ্‌সা নদীর ওপর দিয়ে মন্থর না' খানি যেতে দেখি স্বপ্নের মতো পাল তুলে, যখন দেখি পথের কোল পর্যন্ত তরুণ নির্ভয় ঘাসের মঞ্জুরি এগিয়ে এসেছে, দুপুরের অলস প্রহরে সামনের মাঠটুকুতে শালিকের চলাফেরা দেখি, তখন বিশ্বাস হয়না আমার মত না নিয়ে আমায় এই দুঃখভরা জগতে আনা তার নিষ্ঠুরতা হয়েছে।"

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সংগম', 'মহানগর', 'তেলেনাপোতা আবিস্কার', 'সংসার সীমান্তে', 'ভবিষ্যতের ভার', 'শুধু কেরানী', 'হয়তো', 'বিকৃতক্ষুধার ফাঁদে' প্রভৃতি ছোটগল্পে সমাজের বিভিন্ন স্তরের শোষণ বঞ্চনা নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে।

'ভবিষ্যতের ভার' গল্পে দেখানো হয়েছে এক তরুণ আদর্শবাদী হেড্‌মাস্টারের স্বপ্ন ও আদর্শ দারিদ্র্যের কারণে কিভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় তারই ছবি। বহু স্বপ্ন ও আদর্শ নীতিবোধ ও সততাকে আশ্রয় করে যিনি মানুষ গড়ার কারিগর রূপে হেড্‌মাস্টারের পদ বেছে নিয়েছিলেন, সেই প্রধান শিক্ষকের জীবনের ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য এবং তা থেকে হতাশার ছবি ফুটে উঠেছে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'মহানগর' গল্পে মহানগরের অমানবিকতা ও বিষাক্ততার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। মহানগরের বিকৃত জটিল জীবন তার ভালো লাগেনি। রতনের ব্যর্থ জীবনের অনুভূতিকে লেখক নিম্নোক্ত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন —

'মহানগরের পথে ধূলো। আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ, আমাদের দেশে এখনো কখন কখন কামনা পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে ও বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ

লাগে। মহানগর সব কিছুকে দাগী করে দেয়। সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।'

বালক রতন দিদির শ্বশুরবাড়ী থেকে অপহৃতা হবার পর মহানগরের উল্টো ডিঙ্গি এসে খুঁজে পায়। দিদি তখন গৃহবধূ থেকে বারবনিতায় রূপান্তরিত। এই ক্লেদাক্ত সমাজের বিরুদ্ধে বালক রতন দিদির কাছ থেকে চলে যাবার সময় জানিয়ে যায় - "বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাবো দিদি কারুর কথা শুনবনা।" রতনের মুখ দিয়ে এই প্রতিবাদী ভাষা তুলে ধরেছেন।

'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র নিচু তলার মানুষের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। পেটের দায়ে একদিন পতিতা বৃত্তি বেছে নিতে হয়েছিল এক নারীকে। দুঃখ-দারিদ্র্য, ক্ষুধা, পীড়ন ও আর্থিক অভাবে কি বীভৎস জীবনকে বেছে নিতে হয়েছে সেই অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তৎকালীন সমাজের প্রতি লেখকের ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে পল্লীবাংলার রিক্ত সর্বহারা রূপটিকে লেখক তুলে ধরেছেন। গল্পের নায়ক নিরঞ্জন। কোনদিন তেলেনাপোতা গ্রামে আর ফিরতে পারেনি, অসহায় বৃদ্ধা তার যুবতি কন্যার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন লেখক। তেলেনাপোতাকে আবিষ্কার করবার জন্য মানবতাবোধ ও সহানুভূতির প্রয়োজন বলে লেখক মনে করেছেন।

'শুধু কেরানী' গল্পে এক তরুণ কেরানীর প্রথম সন্তান হবার পর তার স্ত্রীর সূতিকারোগে মৃত্যু ঘটে। মরবার আগে সে ঈশ্বরের কাছে মাথা কুটে বলতে চেয়েছিল মরতে সে চায়নি কিন্তু অর্থনৈতিক অনটনের জন্য চিকিৎসার অভাবে তাকে পরিশেষে মরতে হল। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখকের এই প্রতিবাদ।

'সংসার সীমান্তে' গল্পে পুরুষ শাসিত সমাজে এক রূপহীনা নারীকে বেছে নিতে হয় পতিতাবৃত্তি। কিন্তু সেওতো চেয়েছিল স্বামী সন্তান, সুখ-শান্তি, কিন্তু তার স্বপ্ন কোন দিনই বাস্তবায়িত হয়নি। রজনীর পর রজনী ধরে এই রূপহীনা নারী অতিথির আগমনের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করে থাকে মাত্র। বস্তুত গল্পের নায়িকা রজনী এই ক্লেদাক্ত জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছিল। কিন্তু আদৌ কি সে মুক্তি পেয়েছিল?

এবার আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে আলোচনা করছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে প্রতিবাদী চেতনার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। অর্থনৈতিক শোষণ, ধর্মান্ধতা, প্রশাসনিক দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে প্রতিবাদী চেতনার যথার্থ পরিচয় মেলে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজকাল পরশুর' গল্পতে দেখানো হয়েছে তৎকালীন সমাজপতিদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পেটের দায়ে নারীকে শহরে এসে শরীর ব্যবসায়

নিযুক্ত হতে হয়েছে। তৎকালীন সমাজ ও সমাজপতিদের বিরুদ্ধে মানিকের লেখনী ঝলসে উঠেছে।

'মাটির মাশুল' গল্পে জোতদার ধরণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সুদখোর মজুতদার ধরণী চড়া সুদে ভুবন, রসিক ও তোরাবদের ধান ঋণ দিয়েছিল। অত্যাধিক সুদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ চাষীরা জোতদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

১৯৪৩ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধান' গল্পটি। ইতিমধ্যে অভাবগ্রস্ত মানুদের ঐক্যবদ্ধ করে সোনা মন্ডলের নেতৃত্বে ধানের গোলা লুট করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর এই পরিকল্পনাকে বানচাল করবার জন্য রাতারাতি ধানগুলি সরিয়ে ফেলে শরৎ। তারপর এগারোজন চাষীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এই সংবাদ পেয়ে শরৎ হালদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পে সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

'অসহযোগী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর একটি সার্থক প্রতিবাদী গল্প। মুনাফা লোভী পিতার অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে পুত্র রমেনের প্রতিবাদ লক্ষ্য করবার মত।

বস্ত্র সংকটের পটভূমিকায় লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পে কালোবাজারে বস্ত্র চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। গল্পের নায়ক আনোয়ার স্ত্রী রাবেয়াকে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র দিতে পারেনি বলে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিয়েছে। রাবেয়ার আত্মহত্যা এক মূর্তিমান প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ তার স্বামীর বিরুদ্ধে নয়, তৎকালীন সমাজের বিরুদ্ধে।

'রাঘব মালাকার' গল্পটি যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা। সমগ্র দেশ যখন বস্ত্র সংকটের সম্মুখীন সে সময় নর-পিশাচ কালোবাজারীর বিরুদ্ধে রাঘব মালাকার ও বলরাম বস্ত্রহীন বস্তিবাসীদের নিয়ে প্রতিবাদ জানায়। তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের ফলে মজুতদার গৌতমের সব কাপড় লুণ্ঠন করে নিয়ে বস্ত্রহীন নর-নারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা আর এক প্রতিবাদী গল্প 'হারানের নাতজামাই'। কৃষকনেতা ভুবন মন্ডলকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশ এলে ভুবন মন্ডল ময়নার মার গৃহে আশ্রয় নেয় জামাই জগমোহন সে দিন ছিল পিত্রালয়ে। ময়নার মা সুকৌশলে ভূবন মন্ডলকে জামাই পরিচয় দেয় পুলিশের কাছে। পুলিশ তাকে ধরেনি ময়নার জামাই ভেবে। পরদিন জগমোহন ময়নার মার কাছে এসে এই ঘটনা শোনে। ময়নার মার ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করলে আসল ঘটনা জানবার পর সে ময়নাকে নিয়ে সংসার করে। ময়নার মা এভাবেই নকশাল আন্দোলনের নেতা ভুবন মন্ডলকে বাঁচিয়ে দেয়।

'টিচার' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে প্রতিবাদী চরিত্র গিরীন রাজমাতা হাইস্কুলের শিক্ষকদের সংগঠিত করে মাস পয়লা বেতন ও বেতন বৃদ্ধির দাবী

জানিয়ে শিক্ষক ধর্মঘটে অংশ নেয়। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী গিরীনকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেও গিরীন তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেননি। ফলত গিরীনকে শিক্ষকতার কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু তাকে বরখাস্ত করে দেশের হাজার হাজার শিক্ষক সমাজের দাবীকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রাজনীতি সচেতন শিল্পী ব্যক্তিত্ব। তার গল্পে শ্রেণিসংঘাতের চিত্র রয়েছে। পরিণামে শোষিত মানুষের সংগঠিত রূপ এবং তাদের আত্মশক্তির বিকাশ দেখানো হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্প আমার আলোচ্য বিষয়। বাংলা প্রতিবাদী গল্পের ধারায় সতীনাথ ভাদুড়ীর নামটি উল্লেখের দাবি রাখে, তিনি গল্পের আঙ্গিনাকে বহুদূর পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন সেই সঙ্গে বৈচিত্র্য ও স্বাদে এনেছেন নতুনত্ব। বিহারের শুষ্ক মাটিতে বসে সেই মাটি ও মানুষের জীবন কথা তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। ছোট ছোট মানুষের সুখ-দুঃখ, শোক-ব্যর্থতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং প্রেম ও প্রীতি তাঁর গল্পের বিষয়।

তাঁর 'গণনায়ক', 'বন্যা', 'আন্টা বাংলা', 'পরকীয়া', 'সন-ইন-ল', 'চরণদাস এম.এল.এ.' 'পূতিগন্ধ', 'তলানির স্বাদ' প্রভৃতি গল্পে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। রাজনীতি সচেতন সতীনাথ উপলব্ধি করেছেন সাধারণ মানুষের প্রতি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগের নামে দেশের মানুষকে বঞ্চনা করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে লেখকের ক্রোধ অভিমান, বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। মূলত তিনি রাজনৈতিক ভন্ডামিকে ভালো চোখে দেখেননি। রাজনীতির নামে দুর্নীতি, শোষণ, অত্যাচারকে তিনি সমর্থন জানাননি।

বিহারের গ্রামীণ জীবনের স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, জাতিভেদ প্রথা ও দলাদলি কিভাবে বারে বারে জন-জীবনকে বিপন্ন করে তোলে তার নিখুঁত আলেখ্য তিনি তুলে ধরেছেন 'গণনায়ক' ছোটগল্পে। এ গল্পে দেখানো হয়েছে দেশবিভাগের সীমারেখা যার মাইলস্টোন হচ্ছে নাগর নদীর ওপর একটি কাঠের পুল। কিছু মুনাফাখোর ব্যবসায়ী তাদের মধ্যে মুনীমজি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে তৎপর। লেখক এ ধরনের চরিত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

'বন্যা' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন কুশী নদীর বন্যার ফলে রসিকপুরা গ্রামের মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ। কিন্তু বন্যার পরে শুরু হয় আবার তাদের মধ্যে বিরোধ।

'আন্টাবাংলা' গল্পে বিহারের নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই নীলকররা নাচ-গান, হৈ-চৈ করে সময় কাটিয়েও সাধারণ কৃষকদের উপর অত্যাচার

চালিয়েছে। নীল চাষীদের দেহে নীল কাল শিরার দাগের মতো অত্যাচারের নির্মম রূপটি লেখক তুলে ধরেছেন।

'পূতিগন্ধ' গল্পে ভন্ডামির বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে।

'তলানির স্বাদ' গল্পে ব্যক্তির মিথ্যাচারের জন্য একটি নারীর সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

'পরকীয়া সন-ইন-ল' গল্পে সতীনাথ দেখিয়েছেন শ্রীসাহেবরাম নামের এক এম.এল. এ.-র মূর্খতা ও চালাকির বাস্তব চিত্র। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে শ্রীসাহেব রাম এম. এল. এ. কিভাবে উপমন্ত্রী হয়েছে তার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ' গল্পে কিভাবে রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ মানুষকে উস্‌কে দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে তার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'মা আম্র ফলেষু' গল্পে তৎকালীন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অন্তর্কলহের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'চকাচকি' গল্পে দুবে-দুবেনিকে সামনে রেখে বিশ্বনিন্দুক মুসাফির নাথের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন লেখক।

'মুনাফা ঠাকুরণ' গল্পটি অসাধু ব্যবসায়ী পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত। সমাজজীবনের ও ব্যক্তি জীবনের ত্রুটিকে উপলক্ষ্য করে সতীনাথের এই ব্যঙ্গধর্মী গল্পটি অনবদ্য সৃষ্টি।

'চরণদাস এম.এল.এ.' সতীনাথের একটি ব্যঙ্গাত্মক গল্প। একসময় চরণদাস জনপ্রিয় ছিল কিন্তু এম. এল.এ. হবার পর সে জনগণের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি। তার দেশের বাড়ি ভাড়া দিয়ে রাজধানীতে সপরিবারে চলে যায়। এবার পার্টীর হাইকমান্ডের নির্দেশ অনুসারে তাকে ফিরে আসতে হয় রাজধানী ছেড়ে তার সগৃহে। ভোটারদের সঙ্গে জনসংযোগ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখেন আগে যাদের সঙ্গে তার চেনা পরিচয় ছিল তারাও তাকে ভুলে গেছেন। পার্টিকর্মীরাও তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে চলেছে। অতীত জনপ্রিয়তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য শ্রী সহস্রানন্দ স্বামীজীর স্মরণাপন্ন হন। দেবতাস্বরূপ স্বামীজীর জয়ধ্বনি করে তার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। সরকারী লোক গণনাকারি স্বামীজীকে সাধারণ লোকের সঙ্গে এক তালিকায় রাখতে চাইলে চরণদাস তাতে বাধা দেন। তার উদ্দেশ্য ছিল স্বামীজীকে দেবতার পৃথকাসনে বসিয়ে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা। সতীনাথ আলোচ্য গল্পে এক রাজনীতিবিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ভিন্নস্বাদের গল্প লিখেও প্রতিবাদী গল্প ধারার দক্ষশিল্পী হিসেবে বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর পর আমার আলোচনায় আসছে সুবোধ ঘোষের নাম। গোত্রান্তরের গল্পকার সুবোধ ঘোষ একটি স্মরণীয় নাম। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে বঙ্গ দেশের যন্ত্রণা, বঞ্চনা, কুশ্রিতা, সংক্ষোভ, মন ও মেজাজ নূতনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি মানবিক মূল্যবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সময় কালের আর্থসামাজিক পটভূমিকাকে উপজীব্য করে তাঁর বহু ছোটগল্প রচিত হয়েছে। তিনি ছিলেন সাম্যবাদী ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী।

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল', 'গোত্রান্তর', 'সিঁড়ি', 'সুন্দরম' প্রভৃতি গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য।

'ফসিল' গল্পে আমরা দেখি অঞ্জনগড়ের রাজার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য এসেছিলেন মিঃ মুখার্জী যিনি মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিনিধি। অঞ্জন গড়ের কৃষি ও শিল্পের বিকাশে তিনি নিবেদিত প্রাণ। তারই উদ্যোগে শিল্প প্রতিনিধিরা এসে অঞ্জনগড়ের এক অংশ লিজ নিয়ে অভ্র ও অ্যাসবেসটস খনি থেকে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। এদিকে খনি গর্ভে ৯২জন শ্রমিক চোদ্দ নম্বর পিটের ধ্বসে পড়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, অন্যদিকে রাজার বনভূমি থেকে লাক্ড়ী সংগ্রহ করতে গিয়ে আরও অনেকে প্রাণ হারায় এই সংবাদ প্রকাশিত হলে কৃষক ও শ্রমিক নেতা দুলাল মাহাতোর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করতে পারে ভেবে মিঃ মুখার্জী রাজাকে অনুরোধ করে দুলাল মাহাতোকে গ্রেফ্তার করবার জন্য। একদিকে রাজশক্তি, অন্যদিকে বণিকী সভ্যতা এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি হাত মিলিয়ে শ্রমিক নেতা দুলাল মাহাতোকে খুন করে। তার ডেডবডিও অন্যান্য লাসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সুবোধ ঘোষ এই নৃশংস চিত্র তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস লক্ষ বছর পরেও একদিন ফসিলগুলো আবিস্কৃত হবে।

'গোত্রান্তর' গল্পে আমরা দেখি উচ্চশিক্ষিত সঞ্জয় পেটের দায়ে রতন লাল সুগার মিলে চাকরি নেয়। প্রথমে তার মাইনে ছিল ত্রিশ টাকা। পরে এসে ঠেকে পনের টাকায়। বিশ্ববাণিজ্যে চিনির বাজারে মন্দা দেখা দিলে শ্রমিক ছাটাইয়ের নোটিশ পড়ে সঞ্জয় সেদিন কৃষকদের ধর্মঘটের পরামর্শ দেয়। সঞ্জয় বিপ্লবী হলেও তাকে পরিশেষে আত্মসমর্পণ করতে হয় রায়বাহাদুরের কাছে। গল্পে সমাজ বিশ্লেষণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন।

'সিঁড়ি' গল্পে সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্তের প্রবঞ্চকের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন।

'সুন্দরম' গল্পে আমরা দেখি কৈলাস বাবুর পুত্র সুকুমার ব্রহ্মচারী হতে চেয়েছিল, কোন পাত্রী তার পছন্দ হয়নি একারণে। আর সেই সুকুমার-ই ইরানী বেদেনী হামিদার মেয়ে তুলসীর প্রতি যৌনাসক্ত হয়। তার গর্ভে সন্তান এলে সুকুমার বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে নারী হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। তার মৃত্যুর পর ময়না ঘরের লাস কাটা ডাক্তার সুকুমারের পিতা কুৎসিতা তুলসীর লাস কেটে সৌন্দর্য আবিষ্কার করে। যদু ডোম কৈলাস বাবুর প্রতি ব্যঙ্গ করে বলে শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।

এর মধ্যে তীব্র কশাঘাত নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

'পরশুরামের কুঠার' গল্পে যে জননী স্তন্যদান করে শিশুদের বাঁচিয়েছে তাকে হত্যা করে সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

সুবোধ ঘোষের 'স্বর্গ হতে বিদায়' গল্পে স্বামীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। স্বামী প্রশান্ত ছিল স্বেচ্ছাচারী, প্রতিনিয়ত সে স্ত্রীর উপর অন্যায় আচরণ করত। স্ত্রী অরুণা সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এবার আমার আলোচ্য বিষয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট গল্পকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন বিধ্বস্ত বঙ্গদেশের এক জীবন্ত দলিল হিসেবে তাঁর ছোটগল্প চিহ্নিত। মার্ক্সসীয় চিন্তাচেতনায় বিশ্বাসী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তাকে শিক্ষা দিয়েছে। শোষিত-বঞ্চিত-অসহায় মানুষের আর্তক্রন্দন তিনি শুনেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়োজন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অধিকার', 'কালোজল', 'বন্দুক', 'মাননীয় শিক্ষক মহাশয় সমীপেষু', 'দীঃশাসন', 'হাড়', 'রেকর্ড', 'নীলা', 'আবাদ', 'বীতংস' প্রভৃতি ছোটগল্প। তার 'সৈনিকু' ও নক্রচরিত' গল্প দুটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'আবাদ' গল্পটি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত। এই দাঙ্গা ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত করেছে ভারতকে। হিন্দুস্থানের চিতা থেকে উঠেছে ভূত, আর পাকিস্তানের কবর থেকে উঠেছে জিন। এই দুইশক্তি সম্মিলিতভাবে সাধারণ মানুষকে নিধন করতে থাকে। সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ মানুষের বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

ভারত স্বাধীনতা লাভের পর উদ্বাস্তু সমস্যা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। তিনশোটি ক্যাম্পে সহস্রাধিক উদ্বাস্তু এসে ভিড় করে। এই উদ্বাস্তুরা তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় চন্দ্রবোড়া ও বুনোশূয়োরের রাজত্ব, বাবলা ঝোপ ও শন ঘাসের জঙ্গল সাফাই করে সাতশো একর পতিত জমিতে সোনার ফসল ফলাতে থাকে। এই অগ্রগতিকে ভালোচোখে দেখেনি লোভী জোতদার যতীন ও অনুকূল। তারা গাইবান্ধা ক্যাম্পে আগুন ধরাতে যায়। হিমাংশু সোমের নেতৃত্বে ঢাকার নেত্রকোণা, রংপুর ও পাবনা থেকে দলে দলে অগুণিত মানুষ এসেছিল তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে। সেখানে আঁধার পেরিয়ে ভোরের আলো ফোটে। জোতদারদের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের স-পক্ষে লেখকের বলিষ্ঠ ভাষা আলোচ্য গল্পে প্রকাশ পেয়েছে।

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা এক প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প 'বন্দুক'।

লোকপীড়ক, লোকশোষক, জোতদার লোকনাথ, ফজল, বৃন্দাবন, নুরমামুদ দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাচ্ছিল শোষণ। কৃষক ভাইরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সোনার ফসল ফলিয়ে ছিল। রহমানের নেতৃত্বে তিনভাগের দুভাগ ধান আদায় করতে কৃষক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়। কখনো বা লোকনাথ ও ফজলের মত স্বার্থান্বেষী মানুষেরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভাঙন ধরাতে চায়। পরিশেষে ভাড়াটে খুনে রঘুনাথকে নিযুক্ত করা হয় রহমানকে হত্যা করার জন্য। এজন্য চারটে বন্দুক রঘুনাথকে দেওয়া হয়। কিন্তু রঘুনাথ নিপীড়িত মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে বন্দুক চারটি রহমানের হাতে তুলে দেয়। এই সংবাদ পেয়ে শোষকরা ভীত হয়। শোষকদের পরাজয় এবং শোষিতদের জয় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

'নক্রচরিত' অপর এক প্রতিবাদী গল্প। ক্ষমতার দম্ভে মন্বন্তর ও যুদ্ধকালীন পটভূমিতে অগণিত নিরীহ মানুষের হত্যাকান্ডের নায়ক হন নক্রচরিত ওরফে নিশিকান্ত। কৃত্রিম খাদ্যসংকট ও বস্ত্রসংকটের বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রশাসক যন্ত্রের দালাল নিশিকান্তের বিরুদ্ধে অগণিত মানুষ গর্জে ওঠে শোষিত মানুষের বঞ্চনার প্রতিবাদ আলোচ্য গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন।

'বীতংস' গল্পের সাধু সুন্দরলালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

'কালোজল' গল্পে সমাজ শত্রুদের চিহ্নিত করেছেন লেখক। মথুরাদাস ছিল এই শ্রেণির প্রতিনিধি। সে চাল চোরাচালানকারী। কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে অজস্র মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছিল সে। লেখক এই শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

'শ্বেতকমল' গল্পে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসংগতি দেখানো হয়েছে। গল্পের নায়ক সিদ্ধার্থ পিতৃহীন ও মায়ের একমাত্র সন্তান। ছোটবেলা থেকেই সে ছিল মেধাবী। অর্থাভাবের মধ্যেও সে বি.এ. পরীক্ষায় বসেছিল। অন্যদিকে সিদ্ধার্থের পিছনে রেখে নকল করে পরীক্ষা দিয়েছিল আরেক ছাত্র। ফল প্রকাশের পর দেখা গেল সিদ্ধার্থ ইংরেজিতে ফেল করেছে এবং নকল করা ছেলেটি ডিস্টিংশন পেয়েছে। শিক্ষার নামে এই প্রহসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদরদী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু' গল্পে প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে যে দুর্নীতি রয়েছে তার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

গল্পের নায়ক স্বাধীনকুমার। সে মাইনর স্কুলে স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র। তার স্বপ্ন ছিল একদিন সে উচ্চশিক্ষা লাভ করবে, কিন্তু এই গরিব চাষার ছেলে তার প্রয়োজনীয় বইগুলি কিনতে পারেনি। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে পেটের দায়ে তাকে ধান, চালের আরতদারের বাড়িতে থেকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। টাকার তাগাদায় যেতে হত স্কুল বন্ধ করে। বেশি রাতে পড়াশুনা করবার সময় সে আলোটুকুও পেতোনা। এরপর পরীক্ষা এগিয়ে এল। স্বাধীনকুমারের পরীক্ষার

প্রস্তুতি তেমন ছিলনা। পরীক্ষার হলে একটি প্রশ্নের উত্তরও লিখতে না পেরে পরীক্ষায় খাতায় তার মনের দুঃখের কথা জানালো।

'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু' বলে সম্বোধন করে সন্ধ্যায় ট্রেনের চাকায় আত্মহত্যা করবার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। যে ছাত্রটি একসময় অঙ্কে ১০০তে ১০০পেত ফার্স্ট বা সেকেন্ড হয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হত, এত মেধা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সমস্যার কারণে সে আর শিক্ষালাভ করতে পারেনি।

অর্থনীতিসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মেনে নিতে পারেননি। শিক্ষা শুধু ধনীদের বা গরীবদের জন্য নয়। ছাত্রের মেধার চেয়ে অর্থের মূল্যই যেখানে প্রাধান্য পায় সে ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আলোচ্য গল্পে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। স্বাধীনকুমার চিঠির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল । '.....কেন আমি বাঁচতে পারলাম না, আমার মতো হাজার হাজার ছাত্রের পক্ষ থেকে সেই প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে গেলাম। জবাবটা আপনি ভেবে দেখবেন। কাপুরুষের মতো আত্মহত্যা করছি? না স্যার-না। এ আমর পরাজয় নয় — আমার প্রতিবাদ। বেয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরে এক প্রলয়ের রাত্রে আমার বাবা দেশের মাটিতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। আমার রক্তও দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য তেমনি একটা ইতিহাসের সূচনা রেখে যাবে। সে ইতিহাস কবে গড়ে উঠবে আমি জানি না। আপনি জানেন স্যার, আপনি বলতে পারেন ?'

— এই রক্তাক্ত প্রশ্নচিহ্নটির কে জবাব দেবে !

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত এক জনপ্রিয় গল্প 'টোপ'। মার্কসীয় জীবনাদর্শে বিশ্বাসী লেখক রাজতন্ত্রের চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রামগঙ্গা এস্টেটের রাজা বাহাদুর এন. আর. চৌধুরী তার রোমাঞ্চকর শিকারের কাহিনী অবলম্বনে এই গল্পটি রচিত। রায় বাহাদুরের ছিল শিকারের নেশা। বাঘ হায়না প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে টোপ ফেলে বন্দুক দিয়ে গুলিবিদ্ধ করার মধ্যে সে খুঁজে পেত আনন্দ। খেয়ালী বিলাসী, মেজাজি রায়বাহাদুর মাতৃহারা এক মানব শিশুকে টোপ হিসাবে মধ্যে একটি সাঁকো থেকে জলার ধারে নুড়িতে নামিয়ে দেয়। হঠাৎ গর্জে উঠেছিল রায়বাহাদুরের রাইফেল, এক বিশাল রাঘের মরণ আর্তনাদ ও শিশুর গোঙানি যেন একই সুরে বেজে উঠল। রাজা রায় বাহাদুরের এরূপ হিংস্র প্রকৃতি অর্থাৎ মানব শিশুকে মেরে পশুশিকারের কাহিনী বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

'হাড়' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক সফল প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে রায়বাহাদুর এইচ. এল. চ্যাটার্জী মস্ত বড় এক ধনী ব্যক্তি। তার হবি ছিল বিচিত্র সব হাড় সংগ্রহ । বহুমূল্যে মানুষ, জীবজন্তুর হাড় সে ক্রয় করত। এদিকে শুরু হয়েছিল মন্বন্তর চারদিকে 'ফ্যান দাও ফ্যান দাও' বুভুক্ষু মানুষের চিৎকার। এই সময় গল্প কথক পিতার চিঠি নিয়ে পিতৃবন্ধু রায়বাহাদরের কাছে একটি

চাকরির জন্য আসে। রায়বাহাদুর তার সংগৃহীত হাড়গুলি একের পর এক দেখাতে থাকে। এইসময়ে দূর থেকে গল্পকথক দেখতে পান এক দুর্ভিক্ষ পীড়িত অভুক্ত ছেলে নিকটবর্তী ডাস্টবিন থেকে একটি হাড় নিয়ে চুষছে। এমতাবস্থায় তার উপলব্ধিতে এল একদিকে বিত্তের প্রাচুর্য অন্যদিকে অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের আর্তস্বর। এই বৈষম্যকে দূর করবার জন্য প্রয়োজন মন্ত্র শক্তির।

'রেকর্ড' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক অবিস্মরণীয় গল্প। চীনা মার্কেট থেকে স্বল্পমূল্যে কেনা একটি রেকর্ড বাজাতে গিয়ে সেই সঙ্গীত কোথাকার এবং কি উদ্দেশ্যে রচিত এনিয়ে শুরু হয় নানা জল্পনা কল্পনা। কখনো মনে হয় এটি খাসিয়াদের গান, কখনো নাগাদের ঢাকের শব্দ কিংবা ব্রহ্মপুত্রের গর্জন কখনো মনে হয়েছে। বুনো হাতির গর্জন কিংবা সুইজারল্যান্ডের বিবাহ সংগীত। আবার কখনো মনে হয়েছে ইউরোপের একটি ছোট্টদেশের মুক্তিসংগীত। হিটলারের নাৎসী বাহিনীর অধিকারের সময় মুক্তি যোদ্ধারা শাসন শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানিয়েছে তার ধ্বনি কখনো মনে হয়েছে। কলকাতার বুকে ছাত্রদের উপর লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলি বর্ষণের শব্দ । পরিশেষে আবিষ্কৃত হয় এটি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতিবাদের ভাষা যা নথিভুক্ত হয়ে আছে রেকর্ডের মধ্যে। এই রেকর্ড কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি পারবেনা। যে রেকর্ডটি ঘুমন্ত শিশুর মত লুকিয়ে ছিল তার সংগীতে যেন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

এই যে সুর তা যুগে যুগে, দেশে দেশে কালে কালে এক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচিত্রধর্মী গল্পগুলোর মধ্যে তাঁর প্রতিবাদী গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর আমার আলোচনা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম এসে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অর্থাৎ চল্লিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এমনকি তার পরেও লাঞ্ছিত ব্যর্থ দরিদ্র ও নিঃসঙ্গ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের কথা যারা লিখে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁদের অন্যতম। তাঁর গল্পে ব্যক্তির বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক ভন্ডামির বিরুদ্ধে, শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের 'অবতরণিকা' একটি সফল প্রতিবাদী গল্প। আর্থিক অসঙ্গতির অভাবে পরিবারের সকলে মতামতকে উপেক্ষা করে সুব্রতর স্ত্রী আরতি একটি প্রাইভেট কোম্পানীর চাকরিতে যোগদান করেছে। হিমাংশু মুখুজ্জে ছিলেন তার মনিব। একদিন হিমাংশুবাবুর সঙ্গে আরতির সহকর্মী এডিথের কমিশন নিয়ে মতবিরোধ ঘটে। এডিথ অপমানিত হন। সেদিন শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে এডিথ অফিসে আসেননি, সে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মনিব মিঃ মুখার্জী এডিথ চরিত্র নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। আরতির অন্যান্য সহকর্মীরা তা নীরবে সহ্য করলেও আরতি বলিষ্ঠভাবে তার প্রতিবাদ জানায়। আরতি মনিবকে নির্ভীক চিত্তে জানায়, মিঃ মুখার্জীকে এডিথের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এতে হিমাংশুবাবু আরতির ওপর ক্ষুব্ধ হন। আরতি নারী জাতির প্রতি মনিবের অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

জানিয়েছে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে।

'আবরণ' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বস্ত্র সংকটের বিষয়ে লেখা একটি প্রতিবাদী গল্প। বস্ত্রাভাবে বংশীর স্ত্রী চাঁপাকে নগ্ন হয়ে থাকতে হয়। স্ত্রীর লজ্জা নিবারণের জন্য বংশীকে পতিতা পল্লীতে গিয়ে সুখদার শাড়ী নিয়ে পালাতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে যারা বস্ত্র সংকট সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে গল্পকার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'আকিঞ্চন' গল্পের নায়ক বিজন, সে প্রাক্তন স্কুল শিক্ষকের পুত্র, উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় এসেছে। দারিদ্র্যের তাড়নায় বেকার বিজন পরিচিত মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার নিতে চায়। যেদিন পিতার চিঠি নিয়ে পরিতোষের বাড়ি গিয়েছিল অর্থ ঋণ নেবার জন্য। পরিতোষকে না পেয়ে এক ফুটফুটে তরুণীর আতিথেয়তায় আর সে পরিতোষের কৃপা প্রার্থী হয়নি। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি বিজনের বেকারত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন নরেন্দ্রনাথ।

'পতাকা' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এক প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত রাজনৈতিক গল্প। এই গল্পটির উৎস হল স্বাধীনতা দিবসে হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পতাকা উত্তোলন নিয়ে বিরোধ। হিন্দু নেতা শচীবিলাস স্বাধীনতা দিবসে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য এগিয়ে আসে, অন্য দিকে মকবুল মনসুররা চাঁদমার্কা লিগের পতাকা তুলতে আগ্রহী - এনিয়ে বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। রাজনৈতিক দলাদলির বিরুদ্ধে লেখক এ গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'আলপিন' গল্পে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় হিন্দুরা তাদের বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্বল সব ছেড়ে হিন্দুস্থানে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। এই দুঃসময়ে স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যবসায়ী গৃহহারা মানুষদের নিঃস্ব করে দিতে চেয়েছে।

'পূর্ণ' গল্পে আমরা দেখি পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটেমাটি বিক্রি করে সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক শিক্ষক সপরিবারে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। টালিগঞ্জে এক খালের ধারে একটি বাসা বাড়িতে তারা আশ্রয় নিয়েছিল। এই পরিবেশে তার ছেলে দুটি অসৎ সঙ্গে পড়ে নষ্ট হতে যাচ্ছে। তার মেয়ে দুটিও ছিন্ন বস্ত্র পরে লজ্জা নিবারণ করছে। এই দুরবস্থার হাত থেকে মুক্ত হতে বৃদ্ধ শিক্ষককে রাস্তায় রাস্তায় চানাচুর ফেরি করতে দেখা গেছে। ভাগ্যচক্রে মূল্যবোধ কিভাবে বিনষ্ট হয়ে গেল তার বাস্তব ছবি নরেন্দ্রনাথ এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

'হেডমাস্টার' গল্পে আমরা দেখি সাগরপুর এম . ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালীন অবস্থায় জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে স্বদেশ ভূমি ছেড়ে দীর্ঘ সাতাশ বছর চাকরি করবার পর এক ছাত্রের কৃপায় কলকাতায় একটি ব্যাঙ্কের কেরানী পদ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই চাকরি

সে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেনি।

পূর্বসূরী ও সমকালীন প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত গল্পকারদের পাশাপাশি প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত মহিলা ছোটগল্পকারদের ছোটগল্প নিঃসন্দেহে বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথম মহিলা গল্পকারদের মধ্যে রয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবী, সরসীবালা দেবী প্রমুখ এবং স্বাধীনতা উত্তরপর্বের উল্লেখযোগ্য মহিলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখেন পূর্ণশশী দেবী, শৈলবালা ঘোষ জায়া, জ্যোতির্ময়ী দেবী, রাধারানী দেবী ও নবনীতা দেব সেন প্রমুখ।

উল্লেখপঞ্জী

প্রথম অধ্যায়

১) 'বাংলার লেখক' (১৯৫৭) প্রমথনাথ বিশী — পৃঃ ৩৩.

২) ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ গল্প - — পৃঃ ১৩২

৩) ত্রৈলোক্যনাথ কথাসাহিত্য ভাবনা -বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য — পৃঃ ১৮

৪) ছোটগল্পের কথা - রথীন্দ্রনাথ রায় — পৃঃ ৭৩

৫) ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ গল্প - — পৃঃ ১২৮

৬) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা -শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃঃ ১২৫

৭) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার - ভূদেব চৌধুরী — পৃঃ ৭১

৮) ঘরে বাইরে - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — পৃঃ ৭৯

৯) সবলা/ মহুয়া - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — পৃঃ ১২০

১০) গীতবিতান -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — পৃঃ ৬০

১১) ক্ষিতিমোহন সেনের ডাইরি - ৮ই এপ্রিল ১৯৮৫ — পৃঃ ০৫

১২) চিত্রাঙ্গদা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — পৃঃ ৪২

১৩) আরোগ্য -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — পৃঃ ৪১

১৪) বিলাসের ফাঁসে - — পৃঃ ০৮

১৫) গল্পগুচ্ছ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — পৃঃ ১০৩

১৬) রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ঃ বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্য বিচার ঃস্বস্তি মণ্ডল — পৃঃ ১১০

১৭) বাংলা ছোটগল্প ঃ শিশিরকুমার দাশ — পৃঃ ১০২

১৮) বাংলা গল্পবিচিত্রা - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — পৃঃ ৫২

১৯) বাংলা গল্প বিচিত্রা ঃ পশু, প্রেম, ধ্রুবতারা- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — পৃঃ ১৩৩

২০) বিভূতিভূষণ রচনাবলী ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃঃ ১৪২